কিশোর ক্লাসিক

আলেকজান্দার দ্যুমা-র

কাউণ্ট অভ মণ্টিক্রিস্টো

সেবা প্রকাশনী

প্রজাপতি প্রকাশন
ও
সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক/অনুবাদ

মার্ক টোয়েন

পুডন্‌হেড উইলসন/শেখ আবদুল হাকিম ৪৫/-

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

এলিসা/কাজী মায়মুর হোসেন ৪৬/-

চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন ৪৩/-

মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ ৪৯/-

ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান ৫০/-

জেস/সায়েম সোলায়মান ৪৭/-

দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান/সায়েম সোলায়মান ৯৯/-

দ্য লেডি অভ ব্লসহোম/সায়েম সোলায়মান ৯৯/-

রানি শেবার আংটি/সায়েম সোলায়মান ৯৭/-

মন্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন ৭০/-

পিপ্‌ল অভ দ্য মিস্ট/ইসমাইল আরমান ১১৫/-

দ্য ব্রেদ্‌রেন/ইসমাইল আরমান ১১৬/-

মাইওয়ার প্রতিশোধ/ইসমাইল আরমান ৪৯/-

পার্ল মেইডেন/ইসমাইল আরমান ৮৩/-

মিস্টার মিসন'স উইল/ইসমাইল আরমান ৫৪/-

রাডইয়ার্ড কিপলিং

রূপান্তর : খসরু চৌধুরী

দ্য জাঙ্গল বুকস ২৯/-

এইচ. জি. ওয়েলস

রূপান্তর : সায়েম সোলায়মান

ডক্টর মরোর দ্বীপ ৪২/-

ব্রাম স্টোকার

লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম/ইসমাইল আরমান ৪৯/-

দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস/ইসমাইল আরমান ৬১/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

কাউণ্ট অভ মণ্টিক্রিস্টো

মূলঃ আলেকজান্দার দ্যুমা

রূপান্তরঃ নিয়াজ মোরশেদ

প্রথম প্রকাশঃ১৯৮৬

প্রথম খণ্ড

বন্দী নাবিক

এক

আঠারোশো পনেরো সাল। শেষ মে-র চমৎকার একটি দিন। মার্সেই বন্দরের জেটিতে একদল মানুষ ভিড় জমিয়েছে। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ। মালবাহী জাহাজ 'ফারাও' আজ বন্দরে আসছে, তারই অপেক্ষায় আছে সবাই। দূরে দেখা যাচ্ছে জাহাজটা, সবচেয়ে বড় পালটা কেবল উড়ছে, আর সবগুলো নামানো। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জেটির দিকে। একদিন আগে মার্সেই-এ পৌঁছার কথা ছিলো ফারাও-এর, জনতার চোখে-মুখে উদ্বেগ আর প্রশ্ন; দেরি হলো কেন?

জাহাজের মালিক মঁসিয়ে মোরেল, লাফ দিয়ে নামলেন একটা নৌকায়। মাঝিরা বাইতে শুরু করলো ফারাও-এর দিকে।

চলন্ত জাহাজের গায়ে ভিড়লো নৌকা। দড়ির মই বেয়ে উঠে গেলেন মঁসিয়ে মোরেল। তাঁকে দেখে এগিয়ে এলো জাহাজের ফার্স্ট অফিসার এডমণ্ড দান্তে।

'দেরি হলো কেন? ক্যাপ্টেন কোথায়?' সরাসরি প্রশ্ন করলেন মঁসিয়ে মোরেল।

'ক্যাপ্টেন মারা গেছেন, স্যার।'

'লেক্লার্ক মারা গেছে!'

'হ্যাঁ, স্যার, আমরা নেপলস ছেড়ে আসার ক'দিন পর হঠাৎ উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনদিন পর মারা যান।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না মঁসিয়ে মোরেল। এমন একটা সংবাদ শুনতে হবে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। বেশ সময় লাগলো তাঁর ধাক্কাটা সামলাতে। অবশেষে বললেন, 'আমাদের সবাইকেই একদিন মরতে হবে…' একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মালপত্র সব নিরাপদে আছে তো?'

'হ্যাঁ, স্যার। দাঁগলারের দায়িত্বে আছে ওগুলো। ওর সাথে কথা বলবেন?'

'হ্যাঁ,' বলে জাহাজের পেছন দিকে দাঁগলারের কাছে এগিয়ে গেলেন মোরেল।

'নিশ্চয়ই শুনেছেন, স্যার,' দাঁগলার বললো, 'ক্যাপ্টেন লেক্লার্ক মারা গেছে…।'

'হ্যাঁ। খবরটা এমন অপ্রত্যাশিত! আমি এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি

না।'

'ক্যাপ্টেন মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দান্তে কী করেছে জানেন?' স্পষ্ট ক্রোধ দাঁগলারের কণ্ঠস্বরে। 'জাহাজের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছে নিজের হাতে, কেউ মানুক না মানুক, ক্যাপ্টেন হয়ে বসেছে।'

'তো কী করবে? তোমার হাতে তুলে দেবে কর্তৃত্ব? ক্যাপ্টেন মারা গেলে ফার্স্ট অফিসারেরই তো দায়িত্ব নেয়ার কথা।'

'তা জানি, স্যার। তবে কিনা, জাহাজ পরিচালনার ব্যাপারে আমার—অন্য সবার পরামর্শ নিতে পারত। ওর নির্দেশে এলবায় থামতে হয়েছিল আমাদের। ওখানে পুরো একটা দিন নষ্ট করেছে। সেজন্যেই আমাদের আসতে দেরি হলো, স্যার।'

'এলবায় থেমেছিলে! কেন?'

'কী করে বলব, স্যার, দান্তেকে জিজ্ঞেস করুন।'

'হুঁ। দান্তেকেই জিজ্ঞেস করব।' একটু থামলেন মঁসিয়ে মোরেল। 'মালপত্র সব ঠিকঠাক মত আছে তো?'

'হ্যাঁ, স্যার। জাহাজ নোঙর করা মাত্র খালাসের কাজ শুরু করা যাবে।'

'বেশ, বেশ।'

দান্তের সাথে কথা বলার জন্যে ফিরে এলেন মঁসিয়ে মোরেল।

ইতোমধ্যে জেটির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ফারাও। নোঙ্গর ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে নাবিকরা। বড় পালটাও গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। জাহাজের ধীর গতি আরও ধীর হয়েছে। চলছে কি চলছে না বোঝাই যায় না। দান্তে তদারক করছে খালাসীদের কাজকর্ম।

ওকে ব্যস্ত দেখে দাঁড়িয়ে রইলেন মঁসিয়ে মোরেল। একটু পরেই কাজ শেষ হলো খালাসীদের। সব ক'টা নোঙর ঠিকমত ফেলা হয়েছে। মঁসিয়ে মোরেলের কাছে এসে দাঁড়ালো দান্তে।

'এখন বলুন, স্যার, কী বলবেন,' বললো সে।

'এলবায় একদিন দেরি করলে কেন?'

'ক্যাপ্টেন লেক্লার্ক সেরকমই নির্দেশ দিয়েছিলেন, স্যার। মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমাকে একটা চিঠি দিয়ে বলেছিলেন মার্শাল বার্ট্রাণ্ড-এর কাছে যেন পৌঁছে দিই। উনি নেপোলিয়নের সাথে আছেন এলবায়।'

নেপোলিয়নের নাম শুনে একটু সচকিত হলেন মঁসিয়ে মোরেল। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন নেপোলিয়ন?'

'দেখে তো মনে হলো ভালই, স্যার। আমার সাথে আলাপ হয়েছে ওঁর। অনেক প্রশ্ন করলেন। এদিককার খোঁজখবর নিলেন। কথা প্রসঙ্গে যখন বললাম ফারাও-এর মালিক আপনি তখন খুব খুশি হলেন। বললেন, পলিকার মোরেল বলে কে একজন নাকি তাঁর সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন।'

'আচ্ছা! এ কথা মনে রেখেছেন উনি!' খুশির ছাপ পড়লো মঁসিয়ে মোরেলের চেহারায়। 'পলিকার মোরেল আমার চাচা। কথাটা জানাতে হবে

চাচাকে! নেপোলিয়ন এখনও তাঁর কথা মনে রেখেছেন শুনলে আনন্দে লাফিয়ে উঠবে বুড়ো।' বিষণ্ণ একটু হাসি হাসলেন মঁসিয়ে মোরেল। 'খুব ভালো করেছো, দান্তে, ক্যাপ্টেনের শেষ নির্দেশ শুনে।' সতর্ক ভাবে চারপাশে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। 'কিন্তু সাবধান, আর কেউ যেন জানতে না পারে, তুমি এলবায় চিঠি নিয়ে গিয়েছিলে, নেপোলিয়নের সাথে আলাপ করেছ। কেউ যদি জানতে পারে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাবে তুমি!'

'জি, স্যার,' মৃদু কণ্ঠে বললো দান্তে। 'কিন্তু কী করবো বলুন, ক্যাপ্টেনের শেষ নির্দেশ, তাই ঝুঁকি আছে জেনেও যেতে হয়েছিলো।'

'যাক, ও নিয়ে আর চিন্তা কোরো না। চলো, আমার সাথে খাবে আজ।'

'আজ না, স্যার। আগে আমাকে বাসায় যেতে হবে, বাবার সাথে দেখা না করে আর কোথাও যেতে চাই না।'

'ঠিক আছে, ওঁর সাথে দেখা করে আমার বাড়িতে এসো…'

'আঁ—আঁ, স্যার, মার্সিডিস-এর সাথেও একটু দেখা করতে হবে…'

হাসলেন মঁসিয়ে মোরেল। 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, একশোবার দেখা করবে। বেচারি রোজ আমার দপ্তরে এসে খোঁজ খবর করেছে; ফারাও-এর খবর কী, কবে ফিরবে ইত্যাদি। খুব ভালো মেয়ে মার্সিডিস।'

'এবার আমরা বিয়ে করবো, স্যার।' গর্বিত শোনালো দান্তের ভরাট কণ্ঠস্বর।

'আচ্ছা! কবে?'

'খুব শিগগিরই, স্যার। মার্সিডিস রাজি হলে দু'চার দিনের ভেতরেই। দিন পনেরোর ছুটি দেবেন আমাকে? বিয়ের জন্যে। তাছাড়া একটু প্যারিসেও যেতে হবে।'

'পনেরো দিন কী! আমি তোমাকে তিন মাসের ছুটি দেবো। তিন মাস পরে আবার যাত্রা করবে ফারাও। তখন ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে।'

'ক্যাপ্টেন!' বিস্ময় চেপে রাখতে পারলো না দান্তে। 'ক্যাপ্টেন! আপনি আমাকে ফারাও-এর ক্যাপ্টেন করবেন…!' কৃতজ্ঞতায় বুজে এলো তরুণ দান্তের গলা। আনন্দের অশ্রু টলটল করে উঠলো তার দু'চোখে।

'হ্যাঁ, দান্তে, তোমার যোগ্যতা আছে, ক্যাপ্টেনের জায়গাটাও শূন্য হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মেই এখন এ পদ তোমার পাওয়া উচিত। যাও এবার, তোমার বাবা আর মার্সিডিসের সঙ্গে দেখা করোগে। দু'জনই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।' বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো দান্তে। এমন সময় আবার ডাকলেন ওকে মঁসিয়ে মোরেল। 'একটা কথা, দান্তে, দাঁগলার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?'

'আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না, তবে নাবিক হিসেবে খুব ভালো।'

'ক্যাপ্টেন হয়ে তুমি রাখবে ওকে জাহাজে?'

'নিশ্চয়ই, স্যার।'

জাহাজ থেকে নেমে গেল দান্তে। ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে চললো জেটির ওপর দিয়ে। বুকটা টানটান, ঘাড় সোজা। প্রশংসা মেশানো স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মঁসিয়ে মোরেল।

দুই

মার্সেই-এর জনবহুল পথ ধরে দ্রুত হেঁটে চলেছে দান্তে। কিছুক্ষণের ভেতর বন্দরনগরীর এক দরিদ্র এলাকায় পৌঁছুলো ও। এখানেই একটা ছোট জীর্ণ বাড়িতে থাকেন ওর বাবা। নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকে পড়লো দান্তে। শোয়ার ঘরের দরজাটা আধখোলা। দরজা দিয়ে উঁকি দিলো সে। ওর বাবা, রোগা ফ্যাকাসে একজন মানুষ, শুয়ে আছেন বিছানায়।

'বাবা!' চেঁচিয়ে উঠলো দান্তে। 'আমি ফিরে এসেছি, বাবা!'

বৃদ্ধ মানুষটার মুখ আচমকা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। উঠে বসার চেষ্টা করলেন তিনি। পারলেন না। ছুটে গিয়ে দান্তে ধরলো তাঁকে।

'কী হয়েছে, বাবা! কী হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'কিছু না, বাপ। কিছু না। সব ঠিক হয়ে যাবে এখন। আমার ছেলে ফিরে এসেছে, এখন সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই একটু স্থির হয়ে বোস, সব খবরাখবর শোনা, কেমন ছিলি এ ক'দিন বল!'

'মঁসিয়ে মোরেল বলেছেন, এবার আমাকে ক্যাপ্টেন করবেন,' বললো দান্তে। 'আমাদের ক্যাপ্টেন মারা গেছেন, সে জায়গায় আমাকে নেয়া হবে। বুঝতে পারছো, বাবা, আমি ক্যাপ্টেন হবো, মাত্র বিশ বছর বয়সে! আমাদের আর অভাব থাকবে না, বাবা!'

অনেক চেষ্টা করে শুকনো এক টুকরো হাসি হাসলেন বৃদ্ধ।

দান্তে তাকালো বাবার মুখের দিকে। এতক্ষণে যেন ঠিকমতো খেয়াল করলো বৃদ্ধের মলিন ফ্যাকাসে চেহারা। যাওয়ার আগে কেমন দেখে গিয়েছিলো মনে পড়লো। শুকিয়ে প্রায় কঙ্কাল হয়ে গেছেন এখন।

'বাবা! তুমি অসুস্থ?' উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলো সে।

ছুটে গেল দেয়াল আলমারিটার দিকে। তাকগুলো শূন্য। কোনও খাবার নেই। কিছুই নেই আলমারিতে।

'বাবা! ঘরে একটু খাবার নেই! না খেয়ে আছো? ক'দিন ধরে এই অবস্থা?'

'তুই থাম তো। একটু শান্ত হয়ে বোস। আমার কিছু লাগবে না, কোনও কিছুর অভাব নেই। যা-ও ছিলো এখন আর থাকবে না, তুই এসেছিস।'

'কিন্তু, বাবা, যাওয়ার আগে তো যথেষ্ট টাকা রেখে গিয়েছিলাম, অভাব হওয়ার কথা নয়। কী করেছো ওই টাকা দিয়ে?'

'তুই চলে যাওয়ার পরই তোর বন্ধু কাদেরুশে এসেছিলো ওর কাছ থেকে যে ধার নিয়েছিলাম সেটা ফেরত চাইতে। কোনও কথা শুনতে রাজি হলো না। বললো তক্ষুণি টাকা না পেলে নাকি ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে ওর। আর কী করবো, তুই যা দিয়ে গিয়েছিলি সব দিয়ে দিলাম। ওই টাকায় অবশ্য পুরো ধার শোধ হয়নি। কাকুতি মিনতি করে বললাম, তুই ফিরে এলেই বাকি টাকা শোধ

করে দেবো। যখন বুঝতে পারলো সত্যিই আমার কাছে আর টাকা নেই তখন ক্ষুণ্ণ মনেই ও বিদায় নিলো,' দুর্বল গলায় কথাগুলো বলে গেলেন বৃদ্ধ।

'তারপর! তোমার কাছে তো আর টাকা ছিলো না, এতদিন চললে কী করে? আবার ধার করেছো? চেয়েচিন্তে, না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে থেকেছো? এই নাও...'

বলতে বলতে পকেট থেকে এক মুঠো মুদ্রা বের করে টেবিলের ওপর রাখলো দান্তে—বারোটা সোনার মোহর, ছ'টা রূপার, আর কিছু খুচরো।

চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো বৃদ্ধের। 'কিন্তু এত টাকা তো আমার লাগবে না, বাপ। আমি বুড়ো মানুষ, বুড়ো মানুষের আর খরচ কী? খরচ তো একমাত্র খাবারের, আমার একার আর কত লাগতে পারে...' থেমে গেলেন বৃদ্ধ। কান খাড়া করে শুনলেন কিছু। 'পায়ের শব্দ পাচ্ছি, কেউ আসছে বোধহয়।'

জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো দান্তে।

'কাদেরুশে,' বললো সে।

'দেখেছিস, কেমন ভালো ছেলে কাদেরুশে! নিরাপদে বাড়ি পৌঁছেছিস খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই। খবর পেয়ে আর দেরি করেনি, দেখা করতে আসছে তোর সাথে।'

মাথা নাড়লো দান্তে।

'না, বাবা, আমি বিশ্বাস করি না। বন্ধু হলে আমার অনুপস্থিতিতে টাকাগুলো ফেরত নিতে পারতো না। সত্যিই যদি জরুরি দরকারে নিয়ে থাকে, দরকার মিটে গেলেই আবার দিয়ে দিতে পারতো, যখন জানে তোমার আর কোনো অবলম্বন নেই। না, বাবা, ও বন্ধু হতেই পারে না।'

দরজা খোলাই ছিলো। ঘরে ঢুকলো কাদেরুশে।

'এই যে, এডমণ্ড!' উৎফুল্ল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছো! স্বাগতম, স্বাগতম!'

'ঘরের ছেলে তো ঘরেই আসবে, আর কোথায় যাবে?' বললো দান্তে। 'বাড়ি ফিরতে পেরে খুব খুশি লাগছে।'

'বেশ টাকা পয়সা কামিয়ে ফিরেছো মনে হচ্ছে।' চকচকে, লোভীর চোখে টেবিলের টাকাগুলোর দিকে তাকালো কাদেরুশে।

'ওগুলো বাবার,' শান্ত গলায় বললো দান্তে। 'তবে তোমার যদি টাকার দরকার থাকে তাহলে ওখান থেকে নিতে পারো কিছু।'

'ধন্যবাদ, দান্তে, আমি টাকা নিতে আসিনি। আপাতত টাকার কোনও প্রয়োজন নেই আমার। দাঁগলারের কাছে শুনলাম, তুমি এসেছো; তাই দেখতে এলাম, কেমন আছো। সত্যিই ভাল লাগছে তোমাকে সুস্থ শরীরে দেখে। এবার তোমার বাবার দুঃখ কিছুটা কমবে।'

'সত্যি, তোমার মতো বন্ধু হয় না, কাদেরুশে,' বললেন বৃদ্ধ।

'মঁসিয়ে মোরেল তোমাকে ক্যাপ্টেন করছেন শুনলাম,' কাদেরুশে বললো। তার কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টিতে স্পষ্ট ঈর্ষা।

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো।' বলে বাবার দিকে ফিরলো দান্তে। 'বাবা, এখন তো আর তোমার টাকার অভাব নেই। কিছু খাবার আনাও তাড়াতাড়ি। আমি একটু যাই, মার্সিডিসের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'ঠিক আছে, যা। অনেকদিন তোর পথ চেয়ে বসে আছে মেয়েটা।'

'একজন ক্যাপ্টেনকে বিয়ে করতে পেরে বোধহয় খুশিই হবে মার্সিডিস,' বললো কাদেরুশে।

'আমি ক্যাপ্টেন হই আর না হই, মার্সিডিস আমাকে বিয়ে করবে।' ঝাঁঝ দান্তের কণ্ঠে। ' ও আমাকে ভালোবাসে। তাই আমাকে বিয়ে করবে।'

আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল দান্তে।

কাদেরুশে আরো কিছুক্ষণ থাকলো। দু'চারটে কথা বললো বৃদ্ধের সাথে। তারপর সে-ও বেরিয়ে গেল। রাস্তার পাশে একটা বাড়ির কোনায় অপেক্ষা করছিলো দাঁগলার। সোজা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

'কী বললো, ও ক্যাপ্টেন হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলো দাঁগলার।

'কথাবার্তা শুনে সেরকমই তো মনে হলো।'

'খুব খুশি নিশ্চয়ই ও?'

'খুশি মানে! আমাকে টাকা দিতে চাইলো—ভাবখানা এখনই বড়লোক হয়ে গেছে!'

'এখনো ক্যাপ্টেন হয়নি।' ক্রূর একটা ছায়া পড়লো দাঁগলারের চোখে। 'হয়তো কখনো হবে না...'

এক মুহূর্ত থামলো সে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'বলো তো, মার্সিডিসকে এখনো ভালোবাসে ও?'

'নিশ্চয়ই! তবে ও একা নয়। ফার্নান্দ আছে—মার্সিডিসের খালার ছেলে। সে-ও ভালোবাসে মার্সিডিসকে। সারাদিন তো সে মার্সিডিসদের বাড়িতেই পড়ে থাকে। প্রভুভক্ত কুকুরের মতো ঘোরে ওর পেছন পেছন। ফার্নান্দের হাত থেকে মার্সিডিসকে কেড়ে নেয়া খুব সহজ হবে না দান্তের পক্ষে।'

গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছে দাঁগলার। সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল ওর ঠোঁটে।

'ফার্নান্দের সাথে একটু কথা বলা দরকার,' বললো সে। 'চলো, মার্সিডিসদের বাড়ির পাশের ক্যাফেটায় গিয়ে বসি। মদ খেতে খেতে চোখ রাখা যাবে, কপাল ভালো হলে ফার্নান্দের সাথে দেখা হয়েও যেতে পারে।'

মদের কথা শুনে হাসি দু'কানে গিয়ে ঠেকলো কাদেরুশের। 'চলো চলো। ক্যাফের বাইরে বসে খাবো। কে জানে কী দেখবো...একটা কথা আগেই বলে নিই, মদের দাম কিন্তু দিতে পারবো না, তুমি দেবে।'

তিন

মার্সিডিস অপূর্ব সুন্দরী। দীর্ঘাঙ্গিনী তন্বী তরুণী। ওর ঘাড় ছাড়িয়ে নেমে আসা ঢেউ খেলানো চুলগুলো রাতের মতো কালো। বাঁশির মতো সরু সুন্দর নাক। আয়ত চোখ দুটো যেন আকাশের নীল তারা। এ মুহূর্তে ক্রোধের আগুন জ্বলছে সে চোখে।

'কতবার তোমাকে বলেছি, ফার্নান্দ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না,' ঝাঁঝের সাথে বললো মার্সিডিস। 'এই নিয়ে একশোবারের বেশি বললাম ঐ এক কথা।'

'তুমি নিষ্ঠুর, মার্সিডিস,' করুণ কণ্ঠে অনুনয়ের সুরে বললো ফার্নান্দ। 'তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। সেই ছোটবেলা থেকে তোমাকে ভালোবেসে আসছি, আজীবন বেসে যাবো। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, মার্সিডিস। তুমি যা বলবে তা-ই করবো। আমি ব্যবসা করবো; এই শহরের নামজাদা ব্যবসায়ী হবো; তোমার কোনও সাধ অপূর্ণ রাখবো না। শুধু তুমি বলো, মার্সিডিস, আমাকে...'

'উহ্! থামবে তুমি! দেখ, ফার্নান্দ, তুমি আমার খালার ছেলে। ছোটবেলা থেকেই আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবে দেখে আসছি। তার বেশি কিছু না। তোমাকে বিয়ে করার কথা কখনো মনেও আসেনি। কক্ষনো না!'

'তাহলে কে তোমার স্বামী হবে?' হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলো ফার্নান্দ। 'সৌভাগ্যবান কোনও নাবিক?'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'আমি বলতে চাই, তুমি এডমণ্ড দান্তের জন্যে অপেক্ষা করছো। ওকে তুমি বিয়ে করতে চাও, তাই না? কিন্তু ও হয়তো আর বাড়িতেই ফিরবে না। ও হয়তো—হয়তো ভুলে গেছে তোমাকে...'

'ভুলে গেছে! আমার এডমণ্ড! আমাকে? কী বলছো তুমি? অসম্ভব! ও...ও...' কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এলো মার্সিডিসের কণ্ঠ।

ঘরের এমাথা ওমাথা পায়চারি করতে শুরু করলো ফার্নান্দ; খাঁচায় অবরুদ্ধ সিংহ যেমন করে। হঠাৎ মার্সিডিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তাহেল ঠিক করে ফেলেছো?'

'হ্যাঁ। আমি এডমণ্ডকে ভালোবাসি। ওকেই আমি বিয়ে করবো। ওকে ছাড়া আর কাউকে না। এডমণ্ডকে যদি বিয়ে করতে না পারি জীবনে আমি বিয়েই করবো না।'

'ও এতদিন বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে—হয়তো সাগরে ডুবে মরেছে।'

'সত্যিই যদি ও মরে গিয়ে থাকে, আমিও মরবো।'

'হয়তো ও ভুলে গেছে তোমাকে।' শেষ চেষ্টা করলো ফার্নান্দ।
ঠিক সেই মুহূর্তে উৎফুল্ল একটা চিৎকার ভেসে এলো বাইরে থেকে:
'মার্সিডিস! মার্সিডিস!'
মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মার্সিডিসের চোখ। দরজার কাছে ছুটে গেল ও। ঘরে ঢুকলো এডমণ্ড। ওর দু'বাহুর বাঁধনে ধরা দিলো মার্সিডিস।
কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল ফার্নান্দের মুখ। শরীরের নিচে পাদুটো কেঁপে উঠলো ওর। সশব্দে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো ফার্নান্দ।
এতক্ষণে দান্তে খেয়াল করলো ফার্নান্দকে।
'এ আবার কে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো সে।
'আমার খালাতো ভাই ফার্নান্দ,' জবাব দিলো মার্সিডিস। 'আশা করি ও বন্ধু হিসেবে নেবে তোমাকে।'
সঙ্গে সঙ্গে মার্সিডিসকে ছেড়ে দিয়ে ফার্নান্দের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো দান্তে। কিন্তু ফার্নান্দ ধরলো না হাতটা। উঠলোও না চেয়ার ছেড়ে। তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে দান্তের দিকে তাকালো সে।
'ও,' তাচ্ছিল্যের সাথে বললো দান্তে, 'শত্রু তাহলে, বন্ধু নয়!'
'না! না!' আকুল গলায় মার্সিডিস বললো, 'ভুল করছো তুমি, এডমণ্ড। ফার্নান্দ সত্যিই তোমার বন্ধু হবে। দেখ! এক্ষুণি তোমার হাত ধরবে ও।' বলতে বলতে ফার্নান্দের দিকে তাকালো সে, যেন রানী নিঃশব্দে আদেশ করছে।
মার্সিডিসের সে দৃষ্টি অগ্রাহ্য করতে পারলো না ফার্নান্দ। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দান্তের হাত ধরলো সে; কিন্তু চোখে ঘৃণার দৃষ্টিটা লেগেই রইলো। একটা কথাও বললো না, রুক্ষভাবে দান্তের হাতটা একটু নেড়ে দিয়ে এক ছুটে পাগলের মতো রাস্তায় বেরিয়ে গেল ফার্নান্দ।

দিশেহারার মতো ছুটে চলেছে ফার্নান্দ। কোথায় যাচ্ছে কোনও খেয়াল নেই। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে ও।
মার্সিডিসদের বাড়ি পেরিয়ে ক্যাফেটার সামনে এলো। এমন সময় একটা চিৎকারের শব্দ পৌছুলো ওর কানে।
'ফার্নান্দ! ফার্নান্দ! অমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছো?'
থেমে দাঁড়ালো ফার্নান্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। দাঁগলার আর কাদেরুশের ওপর পড়লো ওর দৃষ্টি। ক্যাফের বাইরে একটা টেবিল দখল করে বসেছে দু'জন। দু'জনেরই সামনে ভরা পানপাত্র। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ওদের দিকে এগিয়ে গেল ফার্নান্দ।
'কী হয়েছে, ফার্নান্দ?' কাদেরুশে জিজ্ঞেস করলো।
'বসো,' বললো দাঁগলার, 'আমাদের সাথে এক পাত্র পান করো।'
ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো ফার্নান্দ।
'তোমাদের সম্ভবত পরিচয় নেই।' দাঁগলারের দিকে ফিরলো কাদেরুশে। 'এসো আলাপ করিয়ে দেই। এ হচ্ছে ফার্নান্দ, আমার বন্ধু, খুব ভালো লোক। আর এ হচ্ছে—' দাঁগলারের দিকে তাকালো সে, 'দাঁগলার। তোমার মতো ও-ও

আমার পুরনো বন্ধু। ফারাও জাহাজে কাজ করে। অনেক দিন সাগরে কাটিয়ে আজই মাত্র ফিরেছে মার্সেইয়ে।'

'খুব খুশি হলাম তোমার সাথে পরিচিত হয়ে,' বললো দাঁগলার।

ফার্নান্দ কিছু বললো না। আসলে বলার মতো অবস্থায় নেই ও। একটা ভুরু সামান্য উঁচু হলো দাঁগলারের, যেন ফার্নান্দের আচরণ ক্ষুব্ধ করেছে ওকে।

'তুমি কিছু মনে কোরো না, দাঁগলার,' পরিস্থিতিটা সামলাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি কাদেরুশে বললো, 'মানসিক ভাবে ও একটু অস্থির আছে তাই ঠিকঠাক মতো সৌজন্য প্রকাশ করতে পারছে না।'

'কেন, কী হয়েছে?' দাঁগলারের প্রশ্ন।

'মার্সিডিস নামে এক মেয়েকে ও ভালোবাসে, কিন্তু মেয়েটা ওকে ভালোবাসে না। তার পছন্দ তোমার জাহাজের ফার্স্ট অফিসার দান্তেকে। শোনা যাচ্ছে খুব শিগগিরই ওদের বিয়ে হবে।'

'কবে?' জিজ্ঞেস করলো দাঁগলার।

'জানি না,' জবাব দিলো ফার্নান্দ। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবটা এখনো কাটেনি ওর।

দাঁগলার ওর গ্লাসটা ভরে দিলো মদ দিয়ে। বললো, 'ক্যাপ্টেন দান্তে আর তার স্ত্রী সুন্দরী মার্সিডিসের নামে আমরা পান করি এসো।'

গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুললো সে। কাদেরুশেও তুললো। ফার্নান্দ দেখলো ওদের দুজনকে। হাত বাড়িয়ে নিলো নিজের গ্লাসটা। এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো ওটার দিকে। তারপর সবেগে ছুঁড়ে দিলো মাটিতে। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো গ্লাসটা। মাটির অনেকখানি জায়গা ভিজে গেল সোনালী মদে। ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে রইলো ফার্নান্দ। কী করছে তা যেন ওর মাথায় ঢুকছে না। আসলে কিছুই ওর মাথায় ঢুকছে না।

নিঃশব্দে বসে আছে ফার্নান্দ। অন্য দু'জনও চুপ। গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ফার্নান্দকে দেখছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েক গ্লাস করে খাওয়া হয়ে গেছে দু'জনের। ঘোর লেগেছে কাদেরুশের চোখে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো কাদেরুশে। আঙুল তুলে জড়িত কণ্ঠে বললো, 'দেখ! দেখ! ঐ যে, ওরা আসছে। কী খুশি দু'জন দেখ!'

মার্সিডিস আর দান্তে গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছে ক্যাফের সামনের পথ ধরে। মুখ দেখেই বোঝা যায় ওদের মনের ভাব।

'মার্সিডিস!...আর সে।' ফিসফিস করে নিজেকেই যেন শোনালো ফার্নান্দ।

দাঁগলার কিছু বললো না। কাদেরুশে চিৎকার করে ডাকলো—'এই, এডমণ্ড! এই যে এখানে। বন্ধুদেরকে চিনতে পারছো না! এতই কি দাম বেড়ে গেছে তোমার, আমাদের দেখেও দেখছো না?'

মার্সিডিসের হাত ধরে টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো দান্তে।

'না, কাদেরুশে, দাম বাড়েনি,' বললো সে। 'দাম বাড়ার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। তবে হ্যাঁ, আজ আমি সুখী! এত সুখী যে মার্সিডিস ছাড়া আর কাউকে দেখতেই পাচ্ছি না।' বলতে বলতে মার্সিডিসের দিকে তাকালো দান্তে।

চাউনিতেই স্পষ্ট হয়ে গেল কতটা গভীরভাবে সে ভালোবাসে মার্সিডিসকে।

ফার্নান্দ খেয়াল করলো ব্যাপারটা। মুহূর্তে দ্বিগুণ হয়ে উঠলো ওর মনের জ্বালা।

'ভালো আছেন তো, মাদাম দান্তে?' একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো কাদেরুশে। সূক্ষ্ম একটু বিদ্রূপের ছোঁয়া তার কণ্ঠস্বরে।

'এখানো আমি মাদাম দান্তে হইনি,' শান্ত গলায় জবাব দিলো মার্সিডিস। 'যতদিন না আমাদের বিয়ে হচ্ছে ততদিন আমাকে ও নামে ডাকবেন না দয়া করে।'

'কিন্তু শিগগিরই তো আপনি মাদাম দান্তে হবেন, না কি? বিয়েটা হচ্ছে কবে, জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো দাঁগলার।

'কাল কি পরশু, দিনটা এখনো ঠিক করিনি আমরা,' মার্সিডিসের দিকে তাকিয়ে দান্তে বললো। 'তুমি আর কাদেরুশে এসো আমাদের বিয়ের ভোজে। দিনক্ষণ পরে জানাবো তোমাদের। এই ক্যাফেতেই হবে আশা করি।'

'শুধু আমি আর কাদেরুশে? ফার্নান্দ আসবে না?' জিজ্ঞেস করলো দাঁগলার।

'নিশ্চয়ই আসবে। মার্সিডিসের খালাতো ভাই, তোমাদের বন্ধু, মানে আমারও বন্ধু। ও না এলে আসবে কে?' একটু হেসে ফার্নান্দের দিকে তাকালো দান্তে।

কোনও জবাব দিলো না ফার্নান্দ। ওর মনের জ্বালাটুকু এবার চোখেও প্রকাশ পেলো। তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালো দান্তের দিকে। 'কাল কি পরশু!' আপন মনে উচ্চারণ করলো দাঁগলার। 'আমরা আসবো তোমার বিয়েতে, ক্যাপ্টেন।'

'এখনো আমি ক্যাপ্টেন হইনি, দাঁগলার,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো দান্তে। একটু থেমে যোগ করলো, 'হ্যাঁ, আমার একটু তাড়া আছে। প্যারিস যেতে হবে…'

'জরুরি কাজ?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো দাঁগলার।

'আঁ, হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন লেক্লার্ক মারা যাওয়ার আগে কাজটা চাপিয়ে গেছেন আমার ঘাড়ে। এখন তাড়াতাড়ি ওটা শেষ করতে পারলে দায়মুক্ত হই।'

'কী কাজ আমি ভালো করেই জানি, বাছাধন,' মনে মনে বললো দাঁগলার। 'মার্শাল বার্ট্রাণ্ড-এর চিঠি নিয়ে যাচ্ছো প্যারিসে নেপোলিয়নের বন্ধুদের কাছে। কথাটা যদি একবার নিরাপত্তারক্ষীদের কানে তোলা যায় তাহলেই মরেছো। রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে ফেঁসে যাবে। আর রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাজা, হয় মৃত্যুদণ্ড নয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর মুখ। এবার বুঝে গেছে কী করতে হবে। দান্তেকে ফাঁসানোর বুদ্ধি এসে গেছে মাথায়। দান্তের দিকে ফিরে মিষ্টি করে হেসে ও বললো, 'বেশ, তাহলে যাও, ভালোয় ভালোয় ঘুরে এসো প্যারিস থেকে। তোমাদের দু'জনেরই সুখ এবং সমৃদ্ধি কামনা করি।'

'আমিও,' জড়িত গলায় যোগ করলো কাদেরুশে।

হাসিমুখে নিজেদের পথে রওনা হলো এডমণ্ড ও মার্সিডিস।

চার

যতক্ষণ না ওরা চোখের আড়ালে গেল তাকিয়ে রইলো তিনজন। ঘৃণায় কুৎসিত হয়ে উঠেছে তিনজনেরই মুখ। দান্তে আর মার্সিডিস পথের একটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই চেঁচিয়ে উঠলো দাঁগলার, 'খানসামা! একটা কলম আর কাগজ এনে দাও তো। তাড়াতাড়ি!'

কিছুক্ষণের ভেতর কাগজ কলম নিয়ে এলো খানসামা। কলমটা তুলে নিয়ে লেখার জন্যে প্রস্তুত হলো দাঁগলার।

'আহ্! কলম!' দার্শনিক ভঙ্গিতে বললো কাদেরুশে। 'নির্বিরোধী সাধারণ একটা জিনিস। কিন্তু ভেবে দেখেছো, কী অসাধারণ ক্ষমতা লুকিয়ে আছে এর ভেতরে? তলোয়ারের চেয়েও মারাত্মক!'

'এটার তো আরো বেশি,' নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললো দাঁগলার। 'এবার দয়া করে একটু চুপ করবে? জরুরি একটা চিঠি লিখতে হবে আমাকে।'

'কী লিখবে? কার কাছে?' জিজ্ঞেস করলো কাদেরুশে।

'এমন একটা চিঠি, দান্তের বারোটা বেজে যাবে।'

'দান্তের বারোটা বেজে যাবে!' প্রায় লাফিয়ে উঠলো ফার্নান্দ। 'কীভাবে? দয়া করে বলো, কীভাবে?'

'আহ্, অমন চিৎকার কোরো না! চুপ করে থাকো, বলছি। মার্সেই আদালতের বিচারকের কাছে লিখবো, দান্তে নেপোলিয়নের হয়ে কাজ করছে, নেপোলিয়ন যাতে ফিরে আসতে পারে সে উদ্দেশ্যে কাজ করছে। ব্যস, রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে ফেঁসে যাবে ব্যাটা…'

'রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে ফেঁসে যাবে!' খুশিতে আরেকটু হলে হাততালি দিয়ে ফেলছিলো ফার্নান্দ। 'তার মানে, হয় মৃত্যুদণ্ড নয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।'

'দেখা যাক হয় কিনা। আগে চিঠিটা লিখতে দাও আমাকে।'

'দাও আমি লিখি,' মিনতি জানালো ফার্নান্দ।

'না, আমিই লিখবো,' দাঁগলার বললো। 'বাঁ হাতে লিখে ফেলবো, দুনিয়ার কেউ টের পাবে না কে লিখেছে…'

'লেখো তাহলে! তাড়াতাড়ি লেখো!' হিংস্রকণ্ঠে চেঁচালো ফার্নান্দ।

বাঁ হাতে কলমটা শক্ত করে ধরলো দাঁগলার। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লিখে চললো:

'ফারাও জাহাজের ফার্স্ট অফিসার এডমণ্ড দান্তে একজন রাষ্ট্রদ্রোহী। সম্প্রতি সে এলবায় গিয়ে নেপোলিয়নের সাথে কথা বলেছে। প্যারিসে নেপোলিয়নের যে সব বন্ধু আছে তাদের জন্যে এলবা থেকে ও একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে যদি ওকে গ্রেপ্তার করতে পারেন তাহলে হয়তো চিঠিটা

পাবেন আপনারা। হয় ওর বাড়িতে, নয়তো ফারাও-এ ওর কেবিনে পাওয়া যাবে চিঠিটা। ওর সঙ্গেও থাকতে পারে। এই পত্র পাওয়া মাত্র অনুগ্রহ করে ব্যবস্থা নেবেন, না হলে হয়তো দেরি হয়ে যাবে।'

লেখা শেষ করে চিঠিটা পড়ে শোনালো দাঁগলার দুই সঙ্গীকে।

'এলবার চিঠিটা সত্যি সত্যি পাওয়া যাবে তো ওর কাছে?' জিজ্ঞেস করলো ফার্নান্দ। 'না হলে কিন্তু লাভ হবে না। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে চিঠিটা লাগবেই।'

'আমার ধারণা যাবে,' জবাব দিলো দাঁগলার। 'চিঠি যদি না-ই থাকবে, প্যারিসে যাচ্ছে কেন?'

ক্রূর একটা হাসি খেলে গেল ফার্নান্দের ঠোঁটে। কাদেরুশে একটু যেন চিন্তিত। বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা বললো না ও।

'এ চিঠির অর্থ দান্তের মৃত্যু,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙলো কাদেরুশে। জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, 'সত্যিই যদি অমন কোনও চিঠি ওর কাছে পাওয়া যায় কেউ ঠেকাতে পারবে না ওর মৃত্যু! না, দাঁগলার, পাঠিও না এ চিঠি!'

খামের ওপর ঠিকানা লিখছিলো দাঁগলার। থেমে সবিস্ময়ে তাকালো কাদেরুশের দিকে।

'কী বলছো তুমি!?'

'ঠিকই বলছি,' জবাব দিলো কাদেরুশে। 'আমার মনে হয় লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়ে যাচ্ছে।'

ফার্নান্দের দিকে তাকালো দাঁগলার।

'তুমি কী বলো, ফার্নান্দ? পাঠাবো এটা, না ছিঁড়ে ফেলবো?'

'পাঠাবে মানে! এক্ষুণি পাঠাবে!' বললো ফার্নান্দ।

ঠিকানা লেখা শেষ করলো দাঁগলার। চিঠিটা ঢোকালো খামের ভেতর। মুখ বন্ধ করে বললো, 'ব্যস্ হয়েছে। আমি নিজে এটা নিয়ে যাবো বিচারকের বাড়িতে। আজ রাতেই।'

'না, দাঁগলার, না!' আকুল গলায় বললো কাদেরুশে।

'কেন না?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো দাঁগলার।

'না কেন?' হিংস্র ফার্নান্দের কণ্ঠস্বর।

'বললাম তো, এর অর্থ দান্তের মৃত্যু।...একথা ঠিক, দান্তেকে এখন আর আমি বন্ধু বলে মনে করি না... কিন্তু না! ওর মৃত্যুতে আমার কোন হাত থাকুক তা আমি চাই না।'

'বেশ,' দাঁগলার বললো। 'পাঠাবো না চিঠি,' বলতে বলতে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও। বললো, 'এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে। জাহাজে যাবো। মাল খালাস করা হচ্ছে, ওখানে থাকা দরকার আমার।'

'চলো, আমিও যাই তোমার সাথে।' টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো কাদেরুশে। ফার্নান্দের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমিও যাবে নাকি?'

'না। আমি এখানেই থাকবো।'

হাঁটতে শুরু করলো দাঁগলার আর কাদেরুশে। কিছুদূর গিয়ে থেমে দাঁড়ালো দু'জন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, ঝুঁকে মাটি থেকে কিছু একটা তুলে নিচ্ছে ফার্নান্দ।

'চিঠিটা তুলে নিচ্ছে ও!' শঙ্কিত গলায় বললো কাদেরুশে।

'আমি জানতাম, ও নেবে,' বললো দাঁগলার।

'তোমার কি মনে হয় ও ওটা বিচারকের কাছে নিয়ে যাবে?'

'কে জানে? অপেক্ষা করে দেখি, ও কী করে।' শান্ত কণ্ঠস্বর দাঁগলারের।

পাঁচ

আজ দান্তের বিয়ে।

দিনটা সুন্দর। চমৎকার আবহাওয়া। নীল আকাশের বুকে সূর্য উজ্জ্বল। পাখির দল মহাফুর্তিতে নেচে গেয়ে অস্থির। 'আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিন আজ,' মনে মনে ভাবছে এডমণ্ড।

বিয়ের অতিথিরা সবাই জড় হয়েছে 'লা রিজার্ভ' ক্যাফেতে। দান্তের জাহাজী সঙ্গীরা সবাই হাজির। প্রত্যেকে তাদের সেরা পোশাক পরে এসেছে। মঁসিয়ে মোরেল এসেছেন। দাঁগলার আর কাদেরুশেও এসেছে। তারপর, ঠিক দুপুর বেলায় এলো এডমণ্ড আর মার্সিডিস। সঙ্গে এডমণ্ডের বৃদ্ধ পিতা ও কনের সহচরীরা। সব শেষে ফার্নান্দ। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৃষ্টি ওর দু'চোখে।

দীর্ঘ টেবিলের এক প্রান্তে বসলো কনে। মঁসিয়ে মোরেল বসলেন তার ডান পাশে। ভীড়ের ভেতর ফার্নান্দকে খুঁজে বের করলো মার্সিডিসের চোখ।

'ফার্নান্দ,' বললো ও, 'তুমি আমার আপন ভাই-এর মতো। তুমি আমার বাঁ পাশে বসবে।'

মার্সিডিসের এই অদ্ভুত কোমল কথা শুনে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল ফার্নান্দের মুখ। একটা কথাও বলতে পারলো না সে। জড়সড় হয়ে বসে পড়লো মার্সিডিসের বাঁ পাশে।

অন্য অতিথিরাও বসলো। শুরু হলো ভোজ।

একমাত্র ফার্নান্দ ছাড়া আর সবারই মনে হয় বেশ খিদে পেয়েছে। তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে তারা। ফার্নান্দ কিছুই মুখে তুলতে পারছে না। চামচ দিয়ে খাবার নেড়েচেড়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। হৈ-চৈ, গল্পগুজব করতে করতে খাচ্ছে সবাই। ফার্নান্দ কেবল চুপ, গম্ভীর।

পাশাপাশি বসেছে কাদেরুশে আর দাঁগলার।

'ফার্নান্দকে দেখ!' ফিসফিস করে বললো কাদেরুশে। 'মড়ার মতো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। কিছুই খাচ্ছে না। ব্যাপার কী?'

'চিঠিটা পাঠিয়েছে নাকি?' একই রকম ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো

দাঁগলার।

'মনে হয়।'

'বেশ। তাহলে অপেক্ষা করো, দেখি।'

দুপুর দুটো পর্যন্ত চললো পান-ভোজন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো দান্তে।

'ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ,' বললো ও, 'এবার আমাদের যেতে হবে। সোয়া দুটোর সময় আমাদের চার্চে পৌঁছানোর কথা।'

এক এক করে উঠে দাঁড়ালো সব অতিথি। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সবাই। মিছিল করে গির্জায় যাওয়ার জন্যে তৈরি। দাঁগলার সর্বক্ষণ চোখ রেখেছে ফার্নান্দের ওপর। এখনো আগের মতোই ফ্যাকাসে ফার্নান্দের মুখ। সবাই যখন ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। চোখেমুখে ফুটে উঠলো নিদারুণ হতাশা। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে ওর। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

দরজার দিকে এগোতে এগোতেও দাঁগলার পেছন ফিরে ফার্নান্দকে দেখছে। হঠাৎ খেয়াল করলো কান খাড়া করে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে ফার্নান্দ। 'কী শুনছে ও?' নিজেকেই শুধালো দাঁগলার। একটু পরেই এলো জবাব।

দূর থেকে ভেসে আসছে অনেক মানুষের ভারি জুতো পরা পায়ের আওয়াজ। ক্রমে এগিয়ে আসছে কাছে। আরো কাছে, আরো কাছে। দরজার বাইরে থেমে গেল পদশব্দ। জোরে দরজায় ধাক্কা দিলো কেউ।

'মহামান্য রাজার নামে বলছি, দরজা খোলো!'

ক্যাফের এক খানসামা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। সেনা কর্মকর্তার পোশাক পরা একজন লোক ঢুকলো ভেতরে, পেছন পেছন চার সৈনিক। খুশিতে চক চক করে উঠলো ফার্নান্দের চোখ।

'আপনাদের ভেতর এডমণ্ড দান্তে কে?' প্রশ্ন করলো কর্মকর্তা।

এগিয়ে এলো দান্তে। 'আমি।'

'মঁসিয়ে দান্তে, আইনের নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। আসুন আমার সঙ্গে!'

মুহূর্তে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা নেমে এলো ক্যাফেতে। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না দান্তে।

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো ওর।

'গ্রেপ্তার করছেন—আমাকে! কিন্তু কেন?...কী অপরাধে? ...বলুন!'

'সে কথা আমি বলতে পারবো না। বিচারকের মুখ থেকেই শুনবেন।'

'কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে আপনার,' বিব্রত কণ্ঠে বললো দান্তে, 'আমি—আমি একজন নাবিক। মাত্র কাল সকালে আমার জাহাজ মার্সেই-এ এসেছে। গ্রেপ্তার করার মতো কোনও অপরাধই আমি করিনি। এখানে আমার বিয়ের ভোজ চলছে। কিছুক্ষণের ভেতর এই মহিলার সঙ্গে,' মার্সিডিসকে দেখালো দান্তে, 'আমার বিয়ে হবে—।'

'দেখুন, এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই,' বললো কর্মকর্তা। 'আমি নির্দেশ পালন করছি মাত্র। আমাকে বলা হয়েছে বাণিজ্য জাহাজ ফারাও-এর ফার্স্ট অফিসার এডমণ্ড দান্তেকে গ্রেপ্তার করতে। নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না, আপনিই এডমণ্ড দান্তে?'

'না নিশ্চয়ই না—' বলতে বলতে অতিথিদের দিকে ফিরলো দান্তে। 'কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে। আশা করি শিগগিরই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, আমি একটু পরেই ফিরে আসবো।' অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে মার্সিডিসের কাঁধে হাত রাখলো ও।

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, ভুল না হয়ে পারে!' কাদেরুশের কানে কানে ফিসফিস করলো দাঁগলার। 'এবার টের পাবে বাছাধন!'

এসব কথা কিছুই শুনতে পেলো না দান্তে। ভীত বিহ্বল মার্সিডিসকে বললো, 'দুশ্চিন্তা কোরো না, মার্সিডিস। নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল হয়েছে। বিচারককে বুঝিয়ে বললেই উনি বুঝতে পারবেন। ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকো।'

মার্সিডিস খামচে ধরলো ওর বাহুর কাছে কোট।

'বুকে সাহস আনো, মার্সিডিস। বলছি তো, আমি ফিরে আসবো। তারপর আমাদের বিয়ে হবে। বাবা, মার্সিডিসকে দেখো।'

পেছন থেকে এগিয়ে এসে মার্সিডিসের হাত ধরলেন বৃদ্ধ। তার বুকের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়লো মেয়েটা।

'শান্ত হও, মা,' বললেন বৃদ্ধ। হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মার্সিডিসের মাথায়। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। এডমণ্ড ফিরে এসে যখন বলবে কী ভুলটাই না করেছিলো সৈনিকরা, তখন একথা মনে করে কেমন হাসবো আমরা ভাবো তো।'

সেনা-কর্মকর্তার দিকে ফিরলো দান্তে।

'আমি তৈরি, মঁসিয়ে।'

'হ্যাঁ, চলুন।'

ঘুরে দাঁড়ালো কর্মকর্তা। জুতোর খটখট আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল ক্যাফে থেকে। পেছনে দান্তে। আরো পেছনে চার সৈনিক। উঠান পেরিয়ে রাস্তার দিকে এগোচ্ছে ওরা।

ক্যাফের বড় হলঘরটায় গুঞ্জন উঠলো। উচ্চকণ্ঠে সবাই প্রশ্ন করছে, দান্তেকে ধরে নিয়ে গেল কেন?

'এডমণ্ড! এডমণ্ড!' জানালার কাছে ছুটে গিয়ে চিৎকার করলো মার্সিডিস। 'ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। আমি অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে, এডমণ্ড! এডমণ্ড!'

'চিন্তা কোরো না, ফিরে আসবো আমি!' ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিলো দান্তে। 'আমি তোমার কাছেই ফিরে আসবো, মার্সিডিস!'

'তোমার চিঠিতে তাহলে কাজ হলো!' ফিসফিস করে বললো কাদেরুশে। 'কাজটা ভালো করলে না, দাঁগলার। হতভাগা বুড়ো আর ওই নিষ্পাপ মেয়েটার কথা একবার ভাবলে না? কাল নিঃসন্দেহে আমি মাতাল হয়ে গেছিলাম, না হলে এ কাজে বাধা দিলাম না কেন? উহ্…' বাহুতে দাঁগলারের হাতের ভয়ঙ্কর চাপ

অনুভব করে থেমে গেল সে।

'চুপ করো, কাদেরুশে,' হিংস্রকণ্ঠে বললো দাঁগলার। 'বুকে ছোরা খেতে না চাও তো চুপ করো। আমাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। দান্তেকে সরিয়ে দিতে পারলে কত সুবিধা ভেবে দেখেছো? ফারাও-এর ক্যাপ্টেন হব্যে আমি; আর ফার্নান্দ, ওই দেখ! মড়ার মতো মুখটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বেচারার...'

মার্সিডিসের দিকে তাকালো সে। ম্লান মুখে একটা চেয়ারে বসে আছে মেয়েটা। দান্তের বাবা দাঁড়িয়ে আছেন এক পাশে। অন্য পাশে ফার্নান্দ, শক্ত করে ধরে আছে মার্সিডিসের হাত। অদ্ভুত এক পৈশাচিক আনন্দ খেলা করছে ওর চোখে।

দাঁত বের করে হাসলো দাঁগলার।

'হ্যাঁ, খুব খুশি হবে ফার্নান্দ। মনের মানুষকে পাওয়ার পথে আর কোনও কাঁটা থাকবে না...'

'বন্দীকে নিয়ে এসো!' নির্দেশ দিলেন বিচারক।

একটা দরজা খুলে গেল। উচ্চকণ্ঠে একটা চিৎকার। হাঁক ছাড়লো দ্বার-রক্ষক: 'বন্দীকে নিয়ে এসো!'

এডমণ্ড দান্তেকে নিয়ে বিচার কক্ষে ঢুকলো সৈনিকরা। দান্তে আর বিচারককে কক্ষে একা রেখে বেরিয়ে গেল তারা। দ্বার-রক্ষকও বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলো দরজা।

বিচারকের নাম মঁসিয়ে দ্য ভিলফোর্ত।

সওদাগরী নাবিকের পোশাক পরা দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ যুবকটির দিকে তাকালেন তিনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন আপাদমস্তক। মুখটা একটু মলিন দেখাচ্ছে বটে, তবে কোনও উত্তেজনার ছাপ নেই তাতে। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো বিচারককে।

টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ টেনে নিতে নিতে বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম কী তোমার?'

'এডমণ্ড দান্তে।'

'করা হয় কী?'

'ফারাও নামের এক সওদাগরী জাহাজের মেট আমি। মাত্র গতকাল মার্সেই-এ ফিরেছে আমার জাহাজ।'

'বয়স কত তোমার?'

'কুড়ি বছর।'

'কোথায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তোমাকে?'

'আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে।'

'বিয়ের অনুষ্ঠানে!'

'হ্যাঁ। তিন বছর ধরে যে মেয়েকে ভালোবাসি একটু পরেই তার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা ছিলো আমার।'

হঠাৎই দান্তের জন্যে কেমন একটু করুণা বোধ করলেন মঁসিয়ে ভিলফোর্ত। তারও খুব শিগগিরই বিয়ে হওয়ার কথা সম্ভ্রান্ত বংশের এক মেয়ের সাথে। সে কথা স্মরণ করে এ মুহূর্তে তিনি দান্তেকে অসুখী করতে চাইলেন না।

'তোমার যা বলার আছে বলো,' সহানুভূতির সাথে বললেন তিনি।

'আপনি আমাকে ঠিক কী বলতে বলছেন আমি বুঝতে পারছি না,' বললো দান্তে।

'আমার কাছে খবর এসেছে, তুমি একজন দেশদ্রোহী। তুমি নাকি নেপোলিয়নকে সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সাহায্য করছো।'

'আমি, দেশদ্রোহী! অসম্ভব, স্যার, একথা সত্যি হতেই পারে না। নেপোলিয়নকে সাহায্য করার কথাও আমি ভাবিনি। আমার একমাত্র ভাবনা কী করে আমার পছন্দের মানুষগুলোকে আমি সুখী করবো—আমার বাবা, মঁসিয়ে মোরেল, মার্সিডিস…'

'তোমার কোনও শত্রু আছে?'

'শত্রু!' বিস্মিত চোখে তাকালো দান্তে বিচারকের দিকে। 'না, মঁসিয়ে! আমার কোনও শত্রু নেই। আমার মতো একজন সাধারণ নাবিকের শত্রু আসবে কোত্থেকে? জাহাজের সবাই আমাকে পছন্দ করে, ভাইয়ের মতো দেখে।'

'ভালো করে ভেবে দেখ, দান্তে। কেউ কি তোমাকে হিংসা করে? তোমার উন্নতি বা সাফল্য সহ্য করতে পারে না?'

চিন্তিত দেখাচ্ছে দান্তেকে। দাঁগলার এবং ফার্নান্দের কথা মনে পড়লো ওর।

'আঁ,…মঁসিয়ে, হ্যাঁ,' অস্পষ্ট কণ্ঠে বললো ও। 'আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। আমি না ভাবলেও কেউ কেউ হয়তো আমাকে শত্রু ভাবে।'

একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন মঁসিয়ে ভিলফোর্ত দান্তের দিকে। বললেন, 'পড়ো এটা।'

চিঠিটা পড়লো দান্তে। আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে উঠলো ওর মুখ।

'হাতের লেখাটা চেনো?' জিজ্ঞেস করলেন ভিলফোর্ত।

'না, মঁসিয়ে। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, যে-ই লিখে থাকুক, সে যে আমার শত্রু তাতে সন্দেহ নেই।'

'হুঁ। কিন্তু যা লিখেছে তা কি সত্যি?'

'না, মঁসিয়ে। এক বিন্দু সত্যি নেই ওতে। আমি শপথ করে বলতে পারি!'

মঁসিয়ে ভিলফোর্ত বুঝতে পারলেন সত্যি কথাই বলছে দান্তে। কোমল সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, 'শোনো, মঁসিয়ে দান্তে, তুমি বন্দী আমি বিচারক, এ কথা ভুলে যাও। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে যেভাবে কথা বলে আমরাও সেভাবে আলাপ করি এসো, খোলাখুলি। কী ঘটেছে ঠিক ঠিক মতো বলো আমাকে, কিছু লুকিও না। মনে রেখো, আমি তোমার ভালো চাই।'

'আপনার সহানুভূতির জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার। এতদিন ভাবতাম আমার কোনো শত্রু নেই, আজ বুঝতে পারছি, একজন হলেও আছে। ঠিক

আছে, স্যার, আপনি যখন আমার ভালো চান সব আপনাকে খুলেই বলছি।

'নেপলস থেকে বাড়ির পথে রওনা হওয়ার ক'দিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন আমাদের ক্যাপ্টেন মঁসিয়ে লেক্লার্ক। আমাদের জাহাজে কোনও ডাক্তার ছিলো না। ফলে বিনা চিকিৎসায় খুব দ্রুত অবনতি হতে লাগলো তাঁর অবস্থার। জাহাজের সবাই আমরা বুঝতে পারলাম বাঁচবেন না ক্যাপ্টেন। এই সময় একদিন বিকেলে আমাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। প্রথমেই আমাকে দিয়ে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন মঁসিয়ে লেক্লার্ক। "আমি মারা যাচ্ছি, এডমণ্ড," তিনি বললেন। "মরার আগে তোমাকে একটা কাজের ভার দিয়ে যেতে চাই। কথা দাও, কাজটা তুমি করবে।"

' "ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন," আমি জবাব দিলাম।

'এরপর তিনি বললেন, "আমার মৃত্যুর পর তুমি জাহাজ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। সরাসরি মার্সেই না গিয়ে এলবায় একটু থামবে…" '

'এলবা! নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তো এখন ওখানেই আছে!' বিড়বিড় করে বললেন বিচারক।

' "…পোর্ট ফেরাজোতে গিয়ে মার্শাল বার্ট্রাণ্ড-এর খোঁজ করে তাঁকে এই চিঠিটা দেবে।" বালিশের নিচ থেকে একটা মুখ বন্ধ খাম বের করে আমার হাতে দিলেন ক্যাপ্টেন। "হয়তো উনিও একটা চিঠি দেবেন তোমাকে। কথা দাও, চিঠিটা যেন প্যারিসে ঠিকানা মতো পৌছায় সে ব্যবস্থা তুমি করবে।" করুণ চোখে ক্যাপ্টেন তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'আমি কথা দিলাম। পর দিনই মারা গেলেন তিনি।'

থামলো দান্তে।

'তারপর তুমি কী করলে?' জানতে চাইলেন ভিলফোর্ত।

'আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে যা করতো। মৃত্যুপথযাত্রী একজনের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম…এলবায় গেলাম, মার্শাল বার্ট্রাণ্ডের সাথে দেখা করে চিঠিটা দিলাম। উনিও আমাকে একটা চিঠি দিলেন, এবং বলে দিলেন আমি নিজে যেন প্যারিসে গিয়ে খামের ওপর লেখা ঠিকানায় চিঠিটা পৌছে দেই। ওই দিনই আবার মার্সেই-এর পথে রওনা হই আমরা। গতকাল পৌছেছি। একটু আগে আমার বিয়ের আসর থেকে আমাকে ধরে আনা হয়েছে, জানি না কেন। এতক্ষণ আমার চার্চে পুরোহিতের সামনে থাকার কথা।'

'বুঝতে পারছি তোমার অবস্থাটা,' একই রকম দয়ালু কণ্ঠে বললেন বিচারক। 'তবু বলবো, কাজটা তুমি ভালো করোনি, দান্তে। সন্দেহ নেই ক্যাপ্টেন লেক্লার্ক ছিলো বোনাপার্টিস্ট, মানে আমাদের রাজার শত্রু—তাকে সাহায্য করেছো তুমি। দোষ অবশ্য তোমার নয়, ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পালন করতে হয়েছে তোমাকে। যা করেছো তা ছাড়া অন্য কিছু করার ছিলো না তোমার।' চুপ করলেন তিনি। তারপর বললেন, 'মার্শাল বার্ট্রাণ্ড-এর চিঠিটা কই? দাও আমাকে। তারপর তুমি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যাও তোমার বিয়ের আসরে। আমি জানি তুমি নির্দোষ।'

নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না দান্তে। নিশ্চিন্ত মনে ফিরে

যাবে বিয়ের আসরে! মানে মার্সিডিসের কাছে, বাবার কাছে! আনন্দে নেচে উঠলো ওর হৃদয়।

'ওহ, স্যার!' কাঁপা কাঁপা গলায় বললো ও, 'কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো? সত্যিই আপনার মতো ভালো লোক হয় না!'

'চিঠিটা দাও।'

'আপনি তো পেয়ে গেছেন ওটা, স্যার। আমার কাছে যা যা ছিলো সবকিছুর সঙ্গে ওটাও নিয়ে গিয়েছিলো ওরা। ওই যে, আপনার টেবিলেই রয়েছে।'

টেবিলের ওপর স্তূপ করে রাখা দান্তের জিনিসগুলোর ভেতর মুখ বন্ধ খামটা দেখলেন মঁসিয়ে ভিলফোর্ত। তক্ষুণি ওটা তুলে না নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কার কাছে লেখা ওটা?'

'কী এক মঁসিয়ে নোয়ারতিয়ের-এর কাছে। ঠিকানা: রু কক-হেরোঁ, নম্বর ১৩।'

কক্ষের ভেতর বজ্রপাত হয়েছে যেন। পাথরের মতো জমে গেছেন মঁসিয়ে ভিলফোর্ত। এক মুহূর্ত পরে কাঁপতে শুরু করলেন তিনি। তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারটায় বসে পড়লেন বিচারক। ছোঁ মেরে তুলে নিলেন মার্শাল বার্ট্রাণ্ড-এর চিঠিটা। আতঙ্কিত চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন, 'মঁসিয়ে নোয়ারতিয়ের··· মঁসিয়ে নোয়ারতিয়ের, রু কক-হেরোঁ, নম্বর ১৩!'

'হ্যাঁ, স্যার,' বললো দান্তে। 'চেনেন নাকি লোকটাকে?'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন বিচারক। দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়ালের মাংসপেশীগুলো। কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'আমি চিনবো! অবশ্যই না। অবশ্যই না। তোমার জানা থাকা দরকার, মঁসিয়ে, রাজার বিশ্বস্ত সেবকরা কখনো রাষ্ট্রদ্রোহীদের চেনে না। তুমি জানো রাজার শত্রুরা নেপোলিয়নকে আবার সিংহাসনে বসানোর চক্রান্ত করছে?'

এ ঘরে ঢোকার পর এই প্রথম একটু শঙ্কিত দেখালো দান্তেকে। 'না, স্যার,' বললো ও, 'এর বিন্দু বিসর্গও আমি জানি না। কসম খেয়ে বলছি, স্যার, আমি কিছু জানি না—কিছুই না।'

তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দান্তের দিকে তাকালেন ভিলফোর্ত। 'লোকটার নাম এবং ঠিকানা তো জানো।'

'নিশ্চয়ই, স্যার। জানতে হয়েছে। নাম ঠিকানা না জানলে খুঁজে বের করবো কী করে?'

আবার কাঁপতে শুরু করেছেন বিচারক। কম্পিত হাতে চিঠিটা খুললেন তিনি। পড়তে শুরু করার আগে দান্তেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাউকে দেখিয়েছো এ চিঠি?'

'না, স্যার। শপথ করে বলছি, কাউকে দেখাইনি।'

একটু যেন নিশ্চিন্ত হলেন ভিলফোর্ত। চিঠিটা পড়লেন। তারপর মুখ ঢাকলেন দু'হাতে।

'কী ব্যাপার, স্যার? আপনি অসুস্থ বোধ করছেন?' সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস

করলো দান্তে।

বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা বললেন না বিচারক। অবশেষে মুখের ওপর থেকে হাত সরালেন তিনি। দান্তে দেখলো, সহানুভূতির লেশমাত্র নেই সে মুখে। বন্ধুভাব দূর হয়ে গেছে। তার বদলে ফুটে উঠেছে নিষ্ঠুর অশুভ এক দৃষ্টি। ভয় পেয়ে গেল দান্তে।

'তুমি পড়েছো চিঠিটা?' চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভিলফোর্ত।

'না, স্যার।'

বিচারক আবার পড়লেন ওটা। আবার দু'হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। আবার অখণ্ড স্তব্ধতা কক্ষে। ভাবছেন ভিলফোর্ত। অশুভ এক ভাবনা। মঁসিয়ে নোয়ারতিয়ের তাঁর বাবা! চিঠিটার কথা জানাজানি হলে বাপ বেটা দু'জনেরই সর্বনাশ অনিবার্য। মঁসিয়ে ভিলফোর্তের সব আশা আকাঙ্ক্ষা উন্নতি এখানেই শেষ। যে মেয়েটার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে তাকে পাওয়ারও প্রশ্ন আর উঠবে না। উপরন্তু প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং চিঠিটার কথা কিছুতেই জানাজানি হতে দেয়া চলবে না। কীভাবে সম্ভব তা? দান্তের মুখ বন্ধ করতে হবে—চিরতরে বন্ধ করতে হবে। একমাত্র তাহলেই ভিলফোর্ত নিরাপদ বোধ করতে পারেন।

অবশেষে মুখ তুললেন বিচারক। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। শান্ত গলায় বললেন, 'এই মুহূর্তে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারছি না, এডমণ্ড দান্তে। তবে হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি যেন ছাড়া পাও সে চেষ্টা আমি করবো। এই চিঠিটা ছাড়া তোমার বিরুদ্ধে আর কোনো প্রমাণ নেই। এটা নষ্ট করে ফেললে প্রমাণও নষ্ট হয়ে যাবে।' বলতে বলতে ঘরের এক ধারে আগুনের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। চিঠিটা ফেলে দিলেন তাতে। নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কাগজটার, ছাই হয়ে যাওয়া। 'ব্যস, এখন কেউ কিছু আর প্রমাণ করতে পারবে না তোমার বিরুদ্ধে।'

'আপনার মতো দয়ালু মানুষ আর হয় না, স্যার,' কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললো দান্তে।

'শোনো,' বললেন ভিলফোর্ত, 'আমি তোমার বন্ধু। শিগগিরই তুমি মুক্তি পাবে, হয়তো রাতের আগেই। কিন্তু একটা কথা, এই চিঠির কথা কাউকে কিছু বলবে না। জীবনে কোনও দিন না। কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে সাফ জবাব দেবে, তুমি এ সম্পর্কে কিছুই জানো না। তা না হলে বিপদে পড়বে তুমি, আর তোমাকে ছেড়ে দেয়ার কারণে আমিও। মঁসিয়ে নোয়ারতিয়েরের নাম বা ঠিকানাও কখনো কারো সামনে উচ্চারণ করবে না।'

'ঠিক আছে, স্যার,' হতভম্বের মতো বললো দান্তে।

'বেশ! আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।'

ঘণ্টা বাজালেন বিচারক। একজন রক্ষী ঢুকলো ঘরে। তার কানে কানে কিছু বললেন তিনি। তারপর ফিরলেন দান্তের দিকে।

'ওর সঙ্গে যাও!' আদেশ করলেন ভিলফোর্ত।

দান্তে বেরিয়ে যেতেই ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। আবার

কাঁপতে শুরু করেছেন। মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ!

'না! না! না!' আপন মনে বলে চলেছেন তিনি। 'কারো জানা চলবে না এচিঠির কথা। জানলে আমার ধ্বংস অনিবার্য! ওই দান্তে ছোকরার মুখ বন্ধ করতে হবে। চিরতরে বন্ধ করতে হবে। একমাত্র তখনই আমি একটু নিরাপদ বোধ করবো। হয় ওকে মরতে হবে নয়তো চিরদিনের জন্যে কারাগারে যেতে হবে...'

ছয়

ছোট্ট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা কক্ষে আটকে রাখা হয়েছে দান্তেকে। যখন ওকে এখানে ঢোকানো হয় তখন বাজে চারটে। তারপর এক এক করে বেশ কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। প্রায়ান্ধকার কামরাটার এক কোণে বসে দান্তে ভাবছে মুক্তির কথা। কান খাড়া করে বাইরের প্রতিটি শব্দ শুনছে। আর মনে করছে, বোধহয় ওকেই বের করে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, ওর দরজা কেউ খুললো না।

'ধৈর্য ধরতে হবে আমাকে,' অবশেষে মনে মনে বললো ও। 'নিশ্চয়ই মঁসিয়ে ভিলফোর্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখবেন।'

সন্ধ্যা হলো। তারপর রাত। প্রায়ান্ধকার কামরাটা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। এখনো তেমনি বসে আছে দান্তে, আর মনে মনে বলছে, ধৈর্য ধরতে হবে আমাকে, ধৈর্য ধরতে হবে।'

রাত যখন প্রায় দশটা, পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো ওর কানে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ওর দরজার বাইরে থেমে দাঁড়ালো। তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ। হুড়কো টানার আওয়াজ। ঘটাং করে খুলে গেল দরজা। চারজন সৈনিক। দু'জনের হাতে মশাল। মশালের আলোয় চকচক করছে সৈনিকদের কাঁধের বন্দুক, কোমরের তলোয়ার।

'আমাকে নিয়ে যেতে এসেছো?' উৎফুল্ল গলায় প্রশ্ন করলো দান্তে।

'হ্যাঁ।'

'মঁসিয়ে ভিলফোর্তের নির্দেশে?'

'হ্যাঁ।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দু'পা এগিয়ে গেল দান্তে। দুজন করে সৈনিক দাঁড়িয়ে গেল ওর দু'পাশে। কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।

বিশাল আদালত ভবনের বাইরে একটা ঘোড়া গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। দান্তেকে ওঠানো হলো সেটায়। দুই সৈনিক বসলো ওর দুপাশে, অন্য দুজন সামনে। কোচোয়ান তৈরিই ছিলো; কষে চাবুক চালালো ঘোড়াগুলোর পিঠে। ছুটতে শুরু করলো গাড়ি।

বন্দর এলাকায় পৌঁছে লাগাম টেনে ধরলো কোচোয়ান। গাড়ি থেকে

নামলো দান্তে। নেমেই দেখলো সামনে জেটির ওপর আধো আলো আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন সৈনিক। সবাই সশস্ত্র।

অবাক হলো দান্তে। মনে মনে প্রশ্ন করলো, 'এত সৈনিক! শুধু আমার জন্যে! কেন?' মুখে অবশ্য এসব কিছুই সে বললো না। জেটির গায়ে বাঁধা একটা নৌকা, রক্ষী প্রধানের নির্দেশে নেমে গেল সেটায়। নৌকার পেছন দিকে বসানো হলো ওকে। দু'পাশে এবং সামনে পেছনে একজন করে সৈনিক। চারজন মাঝি আগে থেকেই বসে ছিলো নৌকায়। দলনেতার নির্দেশে বাইতে শুরু করলো তারা।

সাগরের শীতল হাওয়া চোখে মুখে লাগতে প্রফুল্ল হয়ে উঠলো দান্তের মন। আহ, আবার সাগরের গন্ধ! ঘাড় ফিরিয়ে ডাঙার দিকে তাকালো—ওখানে ওর বাবা রয়েছেন, আছে ওর মার্সিডিস। 'লা রিজার্ভ' ক্যাফের পেছন দিকটা দেখতে পেলো দান্তে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ও ওখানে ছিলো, পাশে ছিলো মার্সিডিস। কী খুশি লাগছিলো তখন!

ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে ডাঙা। এমন সময় সচেতন হলো দান্তে! কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে? খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে কেন নৌকা! ঝট করে তাকালো ও রক্ষীদের দিকে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে?'

'শিগগিরই জানতে পারবে,' জবাব দিলো একজন। 'প্রশ্ন কোরো না, আর কিছু বলবো না আমরা, নিষেধ আছে।' চুপ করে গেল দান্তে। দুশ্চিন্তা ভীড় করে আসতে চাইছে মাথায়। আপন মনে একটু মাথা নেড়ে প্রবোধ দিলো মনকে: এতটুকু নৌকায় বেশিদূর যেতে পারবে না ওরা, নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দেবে। তারপর মুক্তি! কী বলে ধন্যবাদ জানাবে মঁসিয়ে ভিলফোর্তকে?

বন্দরের মুখে পৌঁছে পাল তুলে দিলো মাঝিরা। গতিবেগ একটু বাড়লো নৌকার। তীর পেছনে ফেলে এগিয়ে চললো বার সমুদ্রের দিকে। আবার সেই অশুভ চিন্তাটা উঁকি দিলো দান্তের মনে: কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা ওকে? ডাঙার দিকে যে নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাহলে? আকস্মিক এক ভয়ে পূর্ণ হয়ে উঠলো ওর অন্তর। সবচেয়ে কাছে যে সৈনিকটি বসে আছে তার হাত ধরে আকুল কণ্ঠে বললো—

'আমার নাম ক্যাপ্টেন দান্তে, সব সময় ঈশ্বর ও তাঁর রাজার বিশ্বস্ত থেকেছি; দয়া করে বলো, ভাই, কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে?'

'কী বললে!' বিস্মিত গলায় বললো সৈনিকটি, 'তুমি একজন নাবিক, এবং মার্সেই-এর, আর এখনো তুমি বুঝতে পারোনি কোথায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!'

'না, ভাই, বুঝতে পারিনি। সত্যিই বুঝতে পারিনি। দয়া করে বলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছো।'

'সামনে তাকাও। দেখতে পাবে···'

মুখ তুললো দান্তে। সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে

আসতে চাইলো ওর। সামনে বেশ কিছুটা দূরে, ছোট্ট একটা দ্বীপ। দ্বীপের প্রায় পুরোটা জুড়ে বিরাট এক দুর্গ, অন্ধকারে অশুভ এক দৈত্যের মতো মনে হচ্ছে। শ্যাতো দ্'ইফ! ফ্রান্সের ভয়ঙ্করতম কারাগার। তিনশো বছর ধরে বন্দীদের গিলে খেয়েছে দুর্গটা। যে একবার ঢুকেছে সে আর কখনো বেরিয়ে আসেনি ওখান থেকে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলো দান্তে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। মুহূর্তে সব আশা ভরসা নির্মূল হয়ে গেল ওর।

'শ্যাতো দ্'ইফ!' উন্মত্তের মতো চিৎকার করলো দান্তে। 'কেন··· কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছো ওখানে? আমি তো কোনও অপরাধ করিনি!'

সমস্বরে হেসে উঠলো সবকজন সৈনিক।

'আমি—আমি কি তাহলে বন্দী?'

আরো জোরে হেসে উঠলো সৈনিকরা।

'কিন্তু,··· মঁসিয়ে ভিলফোর্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন···'

'মঁসিয়ে ভিলফোর্ত কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি জানি না,' একজন সৈনিক বললো, 'এটুকু জানি তোমাকে শ্যাতো দ্'ইফ-এ নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদের।'

আর কোনও কথা জোগালো না দান্তের মুখে। মুখ নিচু করে বসে রইলো। 'না! না! এ হতে পারে না!' মনে মনে বললো ও। 'আমি কোনও অপরাধ করিনি! কোনও অপরাধ করিনি! কিন্তু—কিন্তু ওরা যে ওখানেই নিয়ে যাচ্ছে আমাকে! মুক্তির কোনও উপায় কি নেই?'

আচমকা একটা চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালো দান্তে। এক লাফে চলে গেল নৌকার কিনারে। ঝাঁপিয়ে পড়বে পানিতে।

'গেল!' চিৎকার করে উঠলো এক সৈনিক। 'ধরো! ধরো পাগলটাকে!'

লাফ দিয়েছে দান্তে, এক সেকেণ্ড পরে পানিতে পড়বে! ঠিক এই সময় শক্ত একটা হাত ধরে ফেললো ওর বাহু। হ্যাঁচকা এক টানে নৌকার মাঝখানে এনে শুইয়ে ফেললো খোলের ভেতর। বুকের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে ধরলো দশাসই এক সৈনিক। হিংস্র, বুনো আক্রোশে গর্জাতে লাগলো দান্তে। এক সেকেণ্ড পর শীতল একটা ধাতব স্পর্শ পেলো কপালের পাশে।

'নড়েছো কী গুলি ঢুকে যাবে ঘিলুতে!' ঠাণ্ডা হিসহিসে গলায় বললো বুকের ওপরের লোকটা।

ফাঁদে আটকা পড়া জন্তুর মতো নিশ্চুপ পড়ে রইলো দান্তে। বুকের ওপর লোকটা তেমনি চেপে ধরে আছে। বন্দুকের নল ঠেকে আছে কপালের পাশে।

একটু পরেই শক্ত কিছুতে ধাক্কা খেলো নৌকার তলী। এসে গেছে ওরা শ্যাতো দ্'ইফ-এ। নোঙর ফেললো নৌকা। দু'দিক থেকে দু'জন দু'হাত ধরে টেনে তুললো দান্তেকে। নামিয়ে আনলো নৌকা থেকে। ছেঁচড়ে নিয়ে চললো সিঁড়ির দিকে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে চললো উপরে। বাধা দিলো না দান্তে। চরম হতাশায় শিথিল হয়ে আসতে চাইছে শরীর। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো উঠে চললো ও, কী ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে কোনও বোধ নেই যেন।

অন্ধকার একটা উঠানের ওপর দিয়ে ওকে নিয়ে চললো রক্ষীরা। তারপর পাথরের স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা, অন্ধকার গলিপথ, আরো সিঁড়ি, তারপর আবার অন্ধকার গলিপথ। বিরাট একটা ওক কাঠের দরজা পেরোলো। সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে। রক্ষীদের মাপা পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে দান্তে। দেয়ালের কোনায় লাগানো মশালের সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছে চকচক করে উঠছে বন্দুকের নলগুলো।

বেশ কয়েকটা মিনিট পেরিয়ে গেল। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে দান্তে। তারপরঃ

'কয়েদী কোথায়?' কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে উঠলো।

'এই যে এখানে,' জবাব দিলো এক সৈনিক।

'আসতে বলো আমার সাথে। ওর ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'যাও,' বলে দান্তের পিঠে একটা ঠেলা দিলো সৈনিকটা।

ধীর পায়ে এগোলো দান্তে, যেন ঘন কুয়াশার ভেতর হাঁটছে, কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কানে কোনও শব্দ ঢুকছে না ওর। ঢুকলেও অর্থ উদ্ধার করতে পারছে না মস্তিষ্ক। আবার গলিপথ, সিঁড়ি এবং গলিপথ পেরিয়ে ওরা বন্ধ একটা লোহার দরজার সামনে এলো। কেউ একজন খুললো দরজাটা। ক্যাঁচ-কুঁচ শব্দ উঠলো কব্জায়। ছোট্ট একটা আলোকিত কক্ষ। কাঠের টুলের ওপর লণ্ঠন জ্বলছে। কারারক্ষীর মুখের দিকে তাকালো দান্তে। নির্বিকার দাড়িওয়ালা একটা মুখ।

'আপাতত এখানেই থাকতে হবে তোমাকে,' একই রকম কর্কশ স্বরে বললো লোকটা। 'কাল সকালে গভর্নর যদি চান অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে। ওই টেবিলে রুটি আর পানি আছে, খেও। নতুন খড় বিছিয়ে দেয়া হয়েছে মাটিতে, ঘুমাতে কোনও অসুবিধা হবে না। কাল সকালে আবার হয়তো দেখা হবে। শুভরাত্রি।'

দান্তে কিছু বলার আগেই একটা হাত ধাক্কা দিলো ওর পিঠে। হুমড়ি খেয়ে পড়লো দান্তে ঘরের ভেতর। ওঠার আগেই টুলের ওপর থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে বেরিয়ে গেল কারারক্ষী। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল লৌহ কপাট। তালার ভেতর চাবি ঘোরানোর শব্দ। তারপর সব চুপচাপ। অন্ধকারে একা পড়ে রইলো দান্তে।

সারা রাত ছোট্ট কুঠুরিটার ভেতর পায়চারি করে কাটাল দান্তে। পায়চারি করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। তারপর দাঁড়িয়েই রইল। খুব ভোরে কারারক্ষী এসে দেখলো পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে কয়েদী। নির্ঘুম চোখ দুটো টকটকে লাল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খোলা দরজার দিকে। পলকটা পর্যন্ত পড়ছে না।

'ঘুমাওনি সারা রাত?' জিজ্ঞেস করলো রক্ষী।

জবাব দিলো না দান্তে।

'ঘুমাওনি রাতে?' আবার জিজ্ঞেস করলো কারারক্ষী।

এবারও কোনও জবাব নেই।

দান্তের বাহুতে হাত রাখলো রক্ষী। নড়লো না দান্তে। ভয় পেয়ে গেল রক্ষী। একটা ঢোক গিলে বললো, 'খিদে লাগেনি? আমি তোমার নাস্তা নিয়ে

এসেছি।'

এবারও জবাব দিলো না দান্তে। কথাটা যে ওর কানে ঢুকেছে এমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না চেহারায়।

'কী ব্যাপার, কিছু চাও তুমি?' আবার প্রশ্ন করলো রক্ষী।

'আমি গভর্নরের সাথে দেখা করতে চাই,' হিংস্রকণ্ঠে বললো দান্তে।

এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো রক্ষী। হেসে উঠলো হো-হো করে। 'সবাই তাই চায়।' চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো সে। তারপর আবার বললো, 'সবাই তাই চায়, হা-হা-হা!' হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল রক্ষী। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

একলাফে দরজার ওপর গিয়ে পড়লো দান্তে। দমাদম কিল ঘুসি মারতে মারতে চিৎকার করলো বুনো জন্তুর মত। কিন্তু লাভ হলো না। হাতেই ব্যথা পেলো শুধু। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো মেঝের ওপর। দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে রইলো কিছুক্ষণ। ভাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু গুছিয়ে ভাবতে পারলো না কিছুই। ক্লান্ত ও। ভীষণ ক্লান্ত। এক সময় ধীরে ধীরে ওর মাথা নেমে এলো মেঝের ওপর। গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রইলো দান্তে।

অনেকক্ষণ পর, কতক্ষণ জানে না, একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে এলো ওর মাথা। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ চিন্তা ভীড় করে এল মগজে। ওর বাবা আর মার্সিডিস এখন কী করছে? কী করে বেঁচে থাকবে ওরা? কে ওদের জন্যে উপার্জন করবে, ও তো কারাগারে? কেন? কেন ও কারাগারে? কেন ও বিশ্বাস করেছিলো মঁসিয়ে ভিলফোর্তকে? কেন এই ছলনাটুকু করলো ভিলফোর্ত? ঘুরে ঘুরে প্রশ্নগুলো আসতে লাগলো ওর মাথায়। কিন্তু জবাব পেল না একটারও। অস্থির হয়ে উঠলো দান্তে। উঠে পায়চারি শুরু করলো খাঁচায় আবদ্ধ সিংহের মত। এখনও প্রশ্নগুলোর জবাব খোঁজার চেষ্টা করছে। পায়চারি করতে করতে পা ব্যথা হয়ে গেল একসময়। আবার শুয়ে পড়লো ও।

পরদিনও খুব ভোরে এসে দরজা খুললো কারারক্ষী। দেখলো মেঝের ওপর পড়ে আছে দান্তে। প্রাণের কোনও লক্ষণ নেই শরীরে। মরে গেল নাকি?—ভাবলো রক্ষী। টেবিলের ওপর খাবারগুলো তেমনি রয়েছে। স্পর্শও করা হয়নি। এগিয়ে এলো রক্ষী ওর দিকে। দুহাতে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো—

'এই! ওঠো ওঠো! এমন করলে চলবে কী করে? বুকে সাহস আনো। তুমি আত্মহত্যা করতে চাও নাকি? দু'দিন হয়ে গেল, না খেয়ে আছো! কিছু যদি চাও তো বলো, দেখি ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।'

'আমি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'উঁহু, ওটা সম্ভব নয়। নিয়ম নেই। কয়েদীরা চাইলেই গভর্নরের সাথে দেখা করতে পারে না।' থামলো লোকটা। তারপর খুব নরম করে, সহানুভূতি মেশানো কণ্ঠে বললো, 'ইচ্ছে করলেই তুমি আরও ভাল খাবার পেতে পারো—অবশ্য সেজন্যে ট্যাঁকে মাল পানি থাকতে হবে। তোমার কাছে যে নেই তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। আর একটা উপায় আছে, ভালো আচরণ করা। ভালো

ব্যবহার করো, ভালো খাবার পাবে, চাই কি মাঝে মধ্যে উঠোনে যাওয়ারও সুযোগ পাবে।'

'চাই না আমি উঠোনে যেতে, আমি গভর্নরের সাথে দেখা করতে চাই।' গর্জে উঠল দান্তে।

'দেখ হে, বারবার যদি ওই এক কথা বলো, আমি কিন্তু রেগে যাব। আর যদি আমি রাগি, তোমার খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ হয়ে যাবে। আমি আনবো না। সুতরাং সাবধান।'

হেসে উঠলো দান্তে। 'খুবই ভালো হয় তা হলে। তাড়াতাড়ি মরতে পারবো, হা-হা-হা। খাবার দেবে না? ভালো, দিও না। ওতে আমার কিছুই হবে না।'

'আমার হবে,' মনে মনে বললো রক্ষী। প্রতি কায়েদীর দেখাশোনা বাবদ দিনে ছয় পেন্স করে পায় সে। একজন কায়েদী হারানো মানে দৈনিক ওর রোজগার ছয় পেন্স করে কমে যাওয়া। কিছুতেই তা চাইতে পারে না রক্ষী। একটু চুপ করে থেকে সে বললো, 'তুমি যদি ঠিকঠাক মতো থাকো, যা বলি সেই মতো চলো তাহলে হয়তো গভর্নরের সাথে দেখা করতে পারবে। এখন যা করছো তা যদি চালাতে থাকো কোনও দিনই সে সুযোগ পাবে না।

'কখন?' ব্যাগ্র কণ্ঠে জানতে চাইলো দান্তে। 'বলো বলো, কখন তার সাথে দেখা করতে পারব?'

'এক মাস…ছ'মাস…এক বছরও হতে পারে। ক'দিন লাগবে সেটা নির্ভর করছে তুমি কেমন আচরণ করো তার ওপর।'

'এখনই আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। এই মুহূর্তে। এক মাস, ছ'মাস দূরে থাক, এক দিনও আমি দেরি করতে পারবো না। এক্ষণি আমি দেখা করব…এক্ষণি…এক্ষণি!' ক্ষ্যাপাটে গলায় চিৎকার করলো দান্তে।

'না-না, উঁহুঁ হুঁ, এমন করলে কোনও দিনই তুমি তার দেখা পাবে না। বরং অল্প দিনেই পাগল হয়ে যাবে।'

হিংস্রভাবে হেসে উঠলো দান্তে, যেন এখনই অর্ধোন্মাদ হয়ে গেছে সে।

'হ্যাঁ,' বলে চললো রক্ষী, 'এই কুঠুরিতে আগে যে ছিলো সে-ও পাগল হয়ে গেছিল। সব সময় সে কি এক গুপ্তধনের কথা বলতো। গভর্নরকেও বলেছিলো। গভর্নরকে তো প্রস্তাবই দিয়ে বসেছিলো, ছেড়ে দিলে ওর গুপ্তধনের অর্ধেক দিয়ে দেবে। গুপ্তধন, হা! সর্বক্ষণ ওই এক কথা গুপ্তধন…।'

'এখন কোথায় ও?'

'এখন? ওহ, পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে। উন্মাদ একেবারে! মাটির নিচের একটা কুঠুরিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেসব কয়েদী পাগল হয়ে যায় তাদের ওখানেই রাখা হয়। তুমি যদি শান্ত না হও, তোমাকেও পাঠানো হবে!'

'আমি পাগল নই,' শান্ত গলায় বললো দান্তে। তারপর ফিসফিস করে যোগ করলো, 'শোনো! আমার জন্যে কিছু করো, আমার যত টাকা আছে সব দিয়ে দেব তোমাকে। আমার বাবার কাছে একটা খবর পৌঁছে দাও, আমাকে আটকে রেখেছে এখানে! নয়তো মার্সিডিসের কাছে। এই উপকারটুকু করো, আমার যা

আছে সব দিয়ে দেব তোমাকে।'

'না।' মাথা নাড়লো রক্ষী। 'অমন কিছু করলে আমি চাকরিটা খোয়াব। হয়তো কারাগারেই নিয়ে ঢুকিয়ে দেবে। না, মঁসিয়ে, আমি পারবো না।'

'ওরা জানবে কী করে?' অস্থির কণ্ঠে বললো দান্তে।

'কী করে জানবে জানি না, তবে জানবে। না, আমি পারবো না।

'পারবে না?'

'না।'

'তা হলে তৈরি থেকো।' দাঁতে দাঁত ঘষলো দান্তে। 'এক দিন খুন করব তোমাকে। ওই যে টুলটা দেখছো, ওটা নিয়ে দরজার কোনায় দাঁড়িয়ে থাকবো। ভোর বেলায় তুমি যখন ঢুকবে, এক ঘায়ে ঘিলু বের করে দেবো।' বলতে বলতে ও লাফ দিয়ে গিয়ে টুলটা মাথার ওপর তুলে ফেললো। মারার জন্যে না, কী করে মারবে তা দেখানোর জন্যে।

'না! না!' আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করে দরজার দিকে দৌড় দিলো রক্ষী। 'তুমিও ওই লোকটার মত পাগল হয়ে গেছো! আজই গভর্নরকে জানাতে হবে!'

কোনও মতে দরজাটা আটকে তালা লাগিয়ে দিলো সে। তারপর ছুটলো ধুপধাপ পা ফেলে। একটু পরেই ফিরে এলো। সঙ্গে চারজন সৈনিক।

এদিকে টুলটা নামিয়ে রেখে কামরার এক কোণে গিয়ে জড়সড় হয়ে বসেছে দান্তে। ওকে দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলো রক্ষী:

'ও পাগল হয়ে গেছে। ওকে মাটির নীচের কুঠুরিতে নিয়ে যাও। 'পাগলদের নিচে রাখাই উচিত।'

নড়ারও সুযোগ পেলো না দান্তে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ধরে ফেললো সৈনিকরা। টানতে টানতে নিয়ে চললো কুঠুরির বাইরে। খাড়া খাড়া ধাপওয়ালা একটা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলো। সিঁড়ি যেখানে শেষ সেখানেই শুরু কুঠুরিটার। অন্ধ কুঠুরি! দান্তেকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়া হলো লোহার দরজায়। নিকষ কালো আঁধার নেমে এলো দান্তের চারপাশে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে অন্ধের মতো এক পা এক পা করে এগোলো ও। অবশেষে হাত ঠেকলো অমসৃণ পাথরের দেয়ালে। দান্তে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর বসে পড়লো ধীরে ধীরে। যতক্ষণ না অন্ধকার চোখে সয়ে এলো ততক্ষণ বসেই রইলো। চোখ দুটো খোলা। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অন্ধকারের দিকে।

ঠিকই বলেছিলো কারারক্ষী। পাগল হতে আর বিশেষ বাকি নেই দান্তের।

সাত

একদিন দু'দিন করে সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ করে মাস। এখনও বেঁচে আছে ও। ওর সব পরিচয় মুছে গেছে ইতোমধ্যে। ও আর এডমণ্ড

দান্তে নয়, ফারাও জাহাজের প্রথম মেট নয়, মার্সিডিসের প্রেমিক নয়—ও একজন প্রায়োন্মাদ কয়েদী, নম্বর ৩৪।

প্রথমদিকে প্রতিদিন নিয়ম করে প্রার্থনা করতো ও। ছেলেবেলায় মা যত প্রার্থনা শিখিয়েছিলো সব শব্দ করে আওড়াতো। কিন্তু লাভ হয়নি। ঈশ্বর শোনেননি ওর প্রার্থনা। অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠেই রয়ে গেছে ও। আলোর মুখ দেখেনি।

একটা দুটো করে মাসও পেরিয়ে যেতে লাগলো। বছর ঘুরলো। দু'বছর। তিন বছর। তারপর আর সময়ের কোনও হিসেব নেই। প্রতিদিন সকালে যখন রক্ষী খাবার নিয়ে আসে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গালাগাল করে ও। ভয়ে পিছিয়ে যায় রক্ষী। দরজা সামান্য ফাঁক করে কোনমতে খাবারগুলো ঢুকিয়ে দিয়েই পালিয়ে যায়। অনেকবার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছে দান্তের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। কেন কে বলবে?

ইতোমধ্যে সাত বছর পেরিয়ে গেছে। এখনও তেমনি আছে দান্তে। অবশেষে একদিন, মাথার ওপর অস্বাভাবিক কিছু শব্দ শুনতে পেলো ও। অস্বাভাবিক কিছু নড়াচড়া। স্বাভাবিক মানুষের পায়ের আওয়াজ। কী ঘটছে?

ফ্রান্সের কারাগারসমূহের পরিদর্শক শ্যাতো দ্'ইফ পরিদর্শনে এসেছেন। সরেজমিনে খোঁজ খবর নেবেন বন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে। গভর্নর স্বয়ং তাঁকে পথ দেখিয়ে চলেছেন কুঠুরি থেকে কুঠুরিতে। প্রথমে তাঁরা গেলেন শান্তশিষ্ট কয়েদীদের কাছে। সত্যিকার সদিচ্ছা নিয়ে এসেছেন পরিদর্শক। প্রতিটা বন্দীকে প্রশ্ন করছেন তিনি। সবক্ষেত্রেই এক প্রশ্ন, জবাবও এলো একই।

'খাবার কেমন দেয়া হয়?' প্রতিটা ক্ষেত্রে পরিদর্শকের প্রথম প্রশ্ন হলো এটা।

প্রায় প্রতিটি বন্দী জবাব দিলো, 'খুব খারাপ। তবে খুব একটা এসে যায় না তাতে।'

'আর তোমার কুঠুরি?'

'জঘন্য। অবশ্য তাতেও কিছু এসে যায় না।'

'কিছু চাও তুমি?'

'হ্যাঁ চাই। মুক্তি। আমি তো কোনও অপরাধ করিনি, কেন আটকে রাখবেন?'

একই প্রশ্ন, এবং প্রত্যেকের একই জবাব।

'নাহ, কান ঝালাপালা হয়ে গেল,' গভর্নরের কাছে অভিযোগ করলেন পরিদর্শক। 'আপনার বন্দীদের জন্যে কিছু করা আমার সাধ্যের বাইরে। খাবার বা কুঠুরি সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নিতে পারতাম। কিন্তু ওদের স্বাধীনতা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব বন্দীদের দেখা হয়েছে?'

'দু'জন ছাড়া,' বললেন গভর্নর। 'ওই দু'জন পাগল, বিপজ্জনক। ওদের কাছে যাওয়া উচিত হবে না আপনার।'

'পাগল হোক আর বিপজ্জনকই হোক, আমার কর্তব্য আমাকে করতে হবে।

অনুগ্রহ করে নিয়ে চলুন ওদের কাছে।'

ছ'জন সৈনিককে ডেকে নিলেন গভর্নর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে। রওনা হলেন মাটির নিচের কুঠুরিগুলোর দিকে। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন ওঁরা। তারপর অন্ধকার গলিপথ, স্যাঁতসেঁতে। পুঁতিগন্ধময় বাতাস। কবরের গন্ধ কি এমন? আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন পরিদর্শক—

'এখানে মানুষ থাকতে পারে নাকি?'

গভর্নর জবাব দিলেন, 'পাগল মানুষরা পারে।'

প্রায় পৌঁছে গেছেন ওঁরা দান্তের কুঠুরির কাছে। এই সময় গভর্নর ব্যাখ্যা করলেন, 'ভয়ঙ্কর লোক এই এডমণ্ড দান্তে। কড়া নির্দেশ এসেছে আমাদের কাছে, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ওর ওপর।'

'একা এক কুঠুরিতে থাকে?' প্রশ্ন করলেন পরিদর্শক।

'হ্যাঁ।'

'কতদিন ধরে আছে?'

'তা প্রায় সাত বছর।'

'গোড়া থেকেই কি এই কুঠুরিতে আছে?'

'না, না! আগে উপরেই ছিল। তারপর পাগল হয়ে একদিন রক্ষীকে খুন করতে গেল, তখন আমরা ওকে এখানে এনে রেখেছি।'

'ও।' সন্তুষ্ট মনে হলো পরিদর্শককে।

সামনের দিকে আঙুল তুলে গভর্নর বললেন, 'ওই পাশের কুঠুরিতে থাকে আরেক পাগল। এটাও একই রকম ভয়ঙ্কর। লোকটা ইতালীয়। এখানে ওকে পাঠানো হয়েছে ১৮১১তে। দু'বছর পরে পাগল হয়ে যায়।'

'এক দিক দিয়ে অবশ্য ভালো,' বললেন পরিদর্শক। 'পাগল বলে দুর্ভোগটা টের পাচ্ছে কম।'

'ওর পাগলামিটা একটু অদ্ভুত,' বলে চললেন গভর্নর। 'সব সময় কী এক গুপ্তধনের কথা বলে। আপনি যখন এসেছেন নিজ কানেই শুনতে পাবেন। প্রথমে চলুন দান্তের কাছে!'

দান্তের কুঠুরির সামনে থামলেন ওঁরা। সৈনিকদের পরিদর্শকের কাছাকাছি দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন গভর্নর। ভয়ে ভয়ে প্রথমে তালা খুললো রক্ষী। তারপর আস্তে ঠেলে দিলো লোহার কপাট।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো দান্তে। তারপর পাথর হয়ে গেল। নিজের চোখকেও যেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না। স্বপ্ন দেখছে না তো? সাত বছর ধরে রোজ সকালে যে কুৎসিত মুখটা দেখে আসছে আজ তার ব্যতিক্রম! কেন? কারা এরা? ওকে মুক্তি দিয়ে পাগল হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে এসেছে?

আশায় দুলে উঠলো দান্তের হৃদয়। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ও। মুখটা গম্ভীর করে দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন গভর্নর। হতাশ চোখে চাইলেন পরিদর্শকের দিকে। যেন দৃষ্টি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, 'বলেছিলাম না!'

'কী তোমার প্রয়োজন, বলবে আমাকে?' অত্যন্ত কোমল সহানুভূতি

মেশানো কণ্ঠে পরিদর্শক বললেন।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো দান্তে; 'কী আমার অপরাধ আমি জানতে চাই। দয়া করে একজন বিচারকের সামনে নিয়ে চলুন আমাকে! যদি সব দিক বিবেচনা করে উনি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেন, আমি কোনও প্রতিবাদ করবো না, যে কোনও শাস্তি আপনারা দেবেন আমি মাথা পেতে নেবো। আর যদি আমি নির্দোষ হই, ছেড়ে দেবেন আমাকে।'

জবাবে কিছু বললেন না পরিদর্শক। গৎ বাঁধা প্রশ্নগুলোই করে চললেন এক এক করে।

'খাবার কেমন দেয় এরা?'

'আমি জানি না···অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না···কিন্তু আমি কোনও অপরাধ করিনি তবু আমাকে আটকে রাখা হয়েছে কেন?'

'তোমার কুঠুরি সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?'

'ওতেও কিছু এসে যায় না,' জবাব দিলো দান্তে।

'আজ বেশ শান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে,' বললেন গভর্নর। 'এই রক্ষীকে খুন করতে গিয়েছিলে না?'

'হ্যাঁ। তখন আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।' পরিদর্শকের দিকে ফিরলো দান্তে। 'দয়া করে আমার কথা শুনুন, স্যার!' মিনতি করলো ও। 'একবার ভাবুন আমার কথা; আমি তরুণ যুবক, খোলা সাগরের বাসিন্দা; আচমকা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেয়া হলো এখানে। যে মেয়েটাকে ভালবাসতাম তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম···ছিনিয়ে আনা হলো ওর কাছ থেকে···আর আমার বুড়ো বাপ···'

থেমে গেল দান্তে। আর কিছু বলতে পারলো না। অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এলো ওর পরের কথাগুলো।

'তোমার জন্যে যদ্দুর সম্ভব আমি করবো,' বললেন পরিদর্শক। গভর্নরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'এর জন্যে খুব মায়া হচ্ছে আমার। এর বিরুদ্ধে যেসব নথিপত্র আছে আপনার কাছে, আমাকে একটু দেখাবেন।'

'প্রকাশ্য আদালতে আমার বিচার হোক, এ-ই শুধু চাই আমি,' ব্যাকুল কণ্ঠে দান্তে বললো।

'কিন্তু, যতটুকু জানি একজন বিচারকের সামনে তোমাকে হাজির করা হয়েছিলো। কে সে?' জিজ্ঞেস করলেন পরিদর্শক।

'মঁসিয়ে ভিলফোর্ত।'

'মঁসিয়ে ভিলফোর্তের কোনও কারণ ছিল তোমার সাথে শত্রুতা করার?'

'না না! উনি খুব ভাল ব্যবহার করেছেন আমার সাথে।'

'তাহলে উনি নথিপত্রে তোমার সম্বন্ধে যা-যা লিখেছেন, আমি বিশ্বাস করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, স্যার।'

'বেশ। দেখি তোমার জন্যে কী করতে পারি।'

ঘুরে দাঁড়ালেন পরিদর্শক। গভর্নর এবং সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন দান্তের প্রকোষ্ঠ থেকে।

আট

'এবার চলুন, অন্য পাগলটাকে দেখবেন,' বলে এগিয়ে গেলেন গভর্নর অন্ধকার গলিপথ দিয়ে।

'কী নাম ওর?'

'ফারিয়া।'

রক্ষী তালা খুললো দরজার। পরিদর্শক, গভর্নর এবং সৈনিকরা দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে; ফারিয়ার কুঠুরির ভেতর সবার দৃষ্টি। ধীরে ধীরে অন্ধকার সয়ে এলো চোখে। অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলেন পরিদর্শক। বুড়ো এক লোক, প্রায় উলঙ্গ, বসে আছে মেঝেতে। গভীর মনোযোগের সাথে আঁকিবুকি কাটছে বিরাট এক বৃত্তের মাঝখানে। এমন একাগ্রতায় কাজ করছে যে, দরজা খোলার শব্দটা পর্যন্ত সে শুনতে পেলো না। পরিদর্শক যখন তার একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কেবল তখনই সে মুখ তুলে চাইলো।

'কী চাই?' জিজ্ঞেস করলো বৃদ্ধ।

'আমি!' সবিস্ময়ে বললেন পরিদর্শক, 'আমি আর কী চাইব!' তারপর গর্ব মেশানো কণ্ঠে যোগ করলেন, 'আমি কারাগার পরিদর্শক। সরকার আমাকে পাঠিয়েছে তোমাদের অবস্থা দেখতে। এখন বলো, কোনও কিছুর দরকার আছে তোমার?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো ফারিয়া, 'আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই। আমি কোনও অপরাধ করিনি তবু আমাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে। সেই ১৮১১ থেকে। বহুবার বহু আবেদন নিবেদন করেছি ছেড়ে দেয়ার জন্যে। দেখতেই পাচ্ছ, কর্ণপাত করা হয়নি আমার আবেদনে। এখন আরেকবার আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দেয়া হোক!'

যথারীতি এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিলেন না পরিদর্শক। গৎ বাঁধা প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করলেন আবার, 'খাবার সম্পর্কে তোমার মতামত কী?'

'কয়েদখানার খাবার আর কেমন হবে? যেমন হয় তেমন। এবারে নিশ্চয়ই কুঠুরির কথা জিজ্ঞেস করবে? ওই একই জবাব, কয়েদখানার কুঠুরি যেমন হয় তেমন। কিছু এসে যায় না। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলবার আছে…'

'ওই শুরু হলো!' বললেন গভর্নর।

'আমার গুপ্তধন নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই তোমাকে…'

চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন পরিদর্শক। গভর্নরের কানে কানে বললেন, 'ঠিকই বলেছিলেন! লোকটা বদ্ধ উন্মাদ।'

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে একটু মাথা ঝাঁকালেন গভর্নর। তারপর ফারিয়াকে বললেন, 'তোমার ও গল্প আমি জানি। এখানে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত কম বার তো আর বলোনি! প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে আমার।'

পরিদর্শক সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে ফারিয়ার দিকে তাকালেন। সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, 'তোমার এই গুপ্তধন তোমার নিজের জন্যেই রেখে দেয়া উচিত। যখন মুক্তি পাবে তখন কাজে লাগবে।'

'কিন্তু তার আগেই আমি মরে যেতে পারি। সেক্ষেত্রে কোনও দিন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ওগুলো। শোনো! আমি তোমাকে নিয়ে যাব লুকানো জায়গায়। যদি গুপ্তধন না পাও, আবার এখানে এনে অন্ধকূপে ফেলে দিও আমাকে।'

'তোমার এই গুপ্তধন, কত দূরে এখান থেকে?'

'তিনশো মাইল।'

'তিনশো মাইল!' পরিদর্শকের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করলেন গভর্নর। 'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। স্রেফ পালানোর ফন্দি। পুরনো কৌশল। ভীষণ ধড়িবাজ লোক। গুপ্তধন টুপ্তধন সব বানানো কথা। পালানোর ফিকির খুঁজছে ব্যাটা...'

'আচ্ছা একটা কথা বলো,' জিজ্ঞেস করলেন পরিদর্শক, 'এরা যথেষ্ট খাবার দেয় তোমাকে?'

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি ফারিয়া। বলে চললো, 'তাহলে আরেক বুদ্ধি আছে, শোনো! আমি এখানেই থাকি, কোথায় গেলে পাবে গুপ্তধন বলে দিচ্ছি, তোমরা চলে যাও। তাহলে তো আমি আর পালাতে পারবো না, ঠিক না? তারপর সত্যিই যদি তোমরা গুপ্তধন পাও আমাকে ছেড়ে দিও, না পেলে দিও না।'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি।' একটু কঠোর শোনালো পরিদর্শকের গলা।

'তুমিও আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি।' চুপ করলো ফারিয়া। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলো, তারপর শান্ত কণ্ঠে বললো, 'বেশ, আমার ধন আমারই থাক।' আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সে। 'তোমরা না দাও না দিলে, ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দেবেন।'

আর একটা কথাও বললো না ফারিয়া, তাকালোও না কারো দিকে। মেঝেয় বসে পড়ে নিজের কাজে মন দিলো।

গভর্নর ও সৈনিকদের নিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন পরিদর্শক। দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন আবার। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করছে ও?'

'গুপ্তধন বিক্রি করে কত টাকা পাবে তার হিসেব বোধহয়,' একটু হেসে জবাব দিলেন গভর্নর।

ফারিয়া যে সত্যি সত্যিই পাগল সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই দু'জনের একজনেরও।

শ্যাতো দ্'ইফ থেকে বিদায় নেয়ার আগে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন পরিদর্শক। এডমণ্ড দান্তে সম্পর্কে যে সব নথিপত্র সংরক্ষিত আছে কারা-কর্তৃপক্ষের কাছে সেগুলোয় চোখ বুলালেন তিনি। দেখলেন, ওর নামের পাশে লেখা রয়েছে:

'ভয়ঙ্কর লোক। সিংহাসন পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় নেপোলিয়নকে এলবা থেকে পালাতে সাহায্য করেছিলো। কড়াকড়ি ভাবে নজর রাখতে হবে এই বন্দীর ওপর।'

'কারাগারেই থাকবে ও,' নিজ হাতে কথাগুলোর পাশে লিখে দিলেন পরিদর্শক।

পরিদর্শক চলে গেছেন, কিন্তু দান্তের হৃদয়ে রয়ে গেছে আশা। 'এক মাসের ভেতর আমি মুক্তি পাব,' ভাবলো ও।

একমাস চলে গেল। মুক্তি পেলো না দান্তে। তখন ভাবলো, 'ধৈর্য ধরতে হবে। অনেকগুলো কারাগার দেখতে যেতে হবে পরিদর্শককে।' তারপর না আমার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। তিন মাসের ভেতর নিশ্চয়ই এখান থেকে বেরুতে পারবো আমি।

তিন মাস চলে গেল। তারপর আরও কত তিন মাস। শ্যাতো দ্'ইফ-এর মাটির নিচের সেই অন্ধ কুঠুরিতেই রইলো দান্তে। পরিদর্শকের সেই আশ্বাস একটা আধা বিস্মৃত স্বপ্ন হয়েই রইলো। আবার হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হলো ও। মনে মনে বললো, 'মৃত্যু অনেক বেশি কাম্য এখানকার এই জীবনের চেয়ে। মৃত্যু মানে প্রশান্তি, বিশ্রাম। আমাকে মৃত্যু দাও, ঈশ্বর, এ যন্ত্রণা আর সইতে পারছি না। কাল থেকে আর কিছু খাবো না। হ্যাঁ, অনশনে মরবো আমি।'

সত্যিই পরদিন থেকে সকাল সন্ধ্যার খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো দান্তে। প্রথম প্রথম সহজেই পারলো। পরের দিকে তত সহজ হলো না। ক্ষুধায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার দশা, এই সময় খাবার, তা যত নিকৃষ্টই হোক, ছুঁড়ে ফেলে দেয়া সহজ নয়। এখনো যৌবন পেরিয়ে যায়নি ওর। মাঝে মাঝেই সাধ হয়, জীবনটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে; আশায় বুক বাঁধতে। হয়তো একদিন ও বেরোতে পারবে এই বন্দীশালা থেকে। আনমনে তুলে নেয় খাবারের বাটি। মুখে দেয় শুকনো রুটির একটা টুকরো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় পেরিয়ে আসা দিনগুলোর দুঃসহ স্মৃতি। মুহূর্তে উন্মাদ হয়ে ওঠে ও। আছড়ে ফেলে দেয় খাবারগুলো। থু-থু করে ফেলে দেয় মুখে যেটুকু দিয়েছিল সেটুকুও। ফলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে দান্তে। শরীরটা শুকিয়ে হাড় জিরজিরে হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এমন হয়, কিছু দেখতে বা শুনতে পায় না ও। মৃত্যু আর বেশিদূর নয়।

শান্তভাবে শেষ দিনটির অপেক্ষায় আছে দান্তে। তারপর একদিন!

তখন গভীর রাত। ছোট্ট প্রকোষ্ঠের এক পাশের দেয়ালের পেছন থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ ভেসে এলো ওর কানে। অদ্ভুত এক শব্দ! যেন দাঁতাল কোনও জন্তু কুরে কুরে খাচ্ছে পাথর। স্বপ্ন দেখছে না তো দান্তে? না! আওয়াজটা থেমে যায়নি। চলছেই! ভারি পাথর জাতীয় কিছুর পতনের শব্দ একটা। তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

পরদিন ভোরে আবার শুরু হলো শব্দ। এখন যেন আরো কাছ থেকে আসছে। রক্ষী এলো খাবার নিয়ে। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো দান্তে। এ ব্যাটা যদি আওয়াজটা শুনে ফেলে মুশকিল আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে ভাগাতে হবে

এখান থেকে।

বেশ কিছুদিন ধরে রক্ষীর সাথে কথা বলে না দান্তে। কেন বলবে? কী লাভ?—আজ বললো। হিংস্রভাবে চিৎকার করে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে গেল। বন্দীর পাগলামি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে মনে করে কোন মতে খাবারটা রেখেই পালিয়ে গেল রক্ষী।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো দান্তে। কান খাড়া করলো। ক্রমে কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে শব্দ। কেউ কোনও মেরামতের কাজ করছে? ওরই মতো কোনও বন্দী পালানোর চেষ্টা করছে দেয়ালে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে? এত দুর্বল হয়ে গেছে ও, পরিষ্কার করে কিছু ভাবতে পারলো না। তাড়াতাড়ি উঠে খাবারের বাটিটা টেনে নিলো। আবার আশা জেগেছে দান্তের মনে।

চেটেপুটে সবটুকু খাবার খেয়ে নিলো ও। একটু যেন শক্তি পাচ্ছে গায়ে। কুঠুরির এক কোনা থেকে একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে ঘা দিলো দেয়ালে। পরপর তিনবার। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল শব্দ। অখণ্ড নিস্তব্ধতা চারদিকে।

'নিশ্চয়ই কোনও বন্দী!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো দান্তের। 'মিস্ত্রী হলে কাজ চালিয়ে যেতো, থামতো না।'

কান খাড়া করে বসে রইলো ও। কিন্তু অনেকক্ষণ আর কোনও আওয়াজ হলো না। অস্থির হয়ে উঠলো দান্তে। লোকটা কি ভয় পেয়ে গেল? ভয় পেয়ে বন্ধ করে দিলো কাজ? না, আবার শুরু হয়েছে। তবে অনেক আস্তে। শোনা যায় কি যায় না। খুব সাবধানে কাজ করছে এখন সেই বন্দী।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো দান্তে, ওকে ও সাহায্য করবে। কী করে তা-ও ঠিক করে ফেললো। সাবধানে মাটিতে ঠুকে ভেঙে ফেললো পানির কলসিটা। বড় একটা ধারালো টুকরো বেছে নিয়ে শুরু করলো কাজ। আস্তে আস্তে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খসিয়ে আনতে লাগলো দুই পাথরের মাঝখানের জোড়া।

পিঁপড়ের মতো একাগ্রতায় শান্তভাবে কাজ করে চললো ও। তাড়াহুড়ো করলো না। অল্প সময়ের ভেতরেই একটা পাথরের চারপাশের জোড়া খসিয়ে ফেলতে পারলো। টেনে নিয়ে এলো পাথরটা। মোটামুটি আয়তনের একটা গর্ত হলো। কোনও শিশুর শরীর অনায়াসে ঢুকে যাবে ওটার ভেতর। পাথরটা জায়গা মতো বসিয়ে দিলো দান্তে আবার। খসে পড়া ধুলো বালি যত্ন করে নিয়ে লুকিয়ে রাখলো কুঠুরির এক কোনায়।

সন্ধ্যায় খাবার নিয়ে এলো রক্ষী। কুঠুরির ভেতর অস্বাভাবিক কিছু তার নজরে পড়লো না। তবে দান্তের চোখের অদ্ভুত উজ্জ্বলতাটুকু ঠিকই খেয়াল করলো।

'আবার তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছো, চোখ দেখেই বুঝতে পারছি,' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সে।

সারারাত কাজ করলো দান্তে এবং পরের সারাটা দিন। কাজ করতে করতে ও নিজেকে প্রশ্ন করলো, 'কেন হতাশায় ডুবে নষ্ট করলাম এতগুলো বছর? কেন এই বুদ্ধিটা আরো আগে মাথায় এলো না? এতদিন হয়তো পালিয়ে যেতে পারতাম। উহ! কী গাধা আমি? খামোকা সময় নষ্ট করেছি!'

সেদিন দেয়ালের পেছনে কোনো শব্দ শুনলো না ও। অপর বন্দীটি আজ নিশ্চুপ। হয়তো দান্তে যে শব্দ করছে তা শুনে ভয় পেয়েছে সে। হয়তো সে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

'ঠিক আছে, ও যদি আসতে না পারে আমিই যাবো ওর কাছে.' ঠিক করলো দান্তে।

একাগ্র মনে কাজ করে চললো ও। তারপর অকস্মাৎ থেমে পড়তে হলো ওকে। ওপাশে আর দেয়াল নেই। শক্ত, পুরু কাঠের একটা স্তর সামনে। মাটির কলসির কানা দিয়ে ওটা কাটা সম্ভব নয়। আর এগোতে পারবে না দান্তে। অন্তত এখান দিয়ে নয়।

আবার হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হলো দান্তে।

নয়

মুখ মাটিতে গুঁজে বসে আছে দান্তে।

'ও ঈশ্বর!' কাতর কণ্ঠে বললো ও, 'দয়া করো আমাকে। তুমি আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছো, মৃত্যু কেড়ে নিয়েছো। নতুন আশা দিয়েছো। সেই আশাও এখন কেড়ে নেবে? আমাকে দয়া করো, ঈশ্বর! মৃত্যু দাও! মৃত্যু দাও আমাকে, দয়াময় ঈশ্বর। আমার শেষ আশাও এখন কেড়ে নিয়েছো তুমি। আর কী নিয়ে আমি বাঁচবো?'

'কে ঈশ্বরের কথা বলে, নৈরাশ্যের কথা বলে?' একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। মাটির নিচ থেকে উঠে এলো আওয়াজটা। যেন কবরের গহ্বর থেকে কথা বলে উঠলো কেউ।

এক মুহূর্ত আতঙ্কে স্থির হয়ে রইলো দান্তে। কে কথা বললো? অশুভ কোনো প্রেতাত্মা? নাকি সত্যিই ও পাগল হয়ে গেছে?

ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেল ওর। চিৎকার করে উঠলো, 'কথা বলো! মানুষ বা ভূত যা-ই হও কথা বলো!'

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো কণ্ঠস্বর।

'হতভাগ্য এক কয়েদী।'

'ফ্রেঞ্চ?'

'হ্যাঁ। আমার নাম এডমণ্ড দান্তে। নাবিক ছিলাম।'

'এখানে কেন পাঠিয়েছে?'

'জানি না। আমি কোন অপরাধ করিনি। কিন্তু ওরা বলছে, আমি নাকি ফ্রান্সে ফিরে আসতে সাহায্য করছিলাম নেপোলিয়নকে...'

'ফিরে আসতে!... কোথায় গেছে সে?'

'১৮১৪ সালে তাকে এলবায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তুমি জানো না?'

'১৮১১ থেকে আমি এখানে আটকা।'

'আমার চেয়ে চার বছর বেশি।'

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর আবার কথা বললো কণ্ঠস্বর। 'মন দিয়ে শোনো, তোমার আর কাজ না করলেও চলবে। ঠিক কোথায় আছো তুমি, বলো।'

'আমার কুঠুরিতে।'

'দরজাটা কোন দিকে?'

'উঠোনে গিয়ে শেষ হওয়া একটা গলিপথের সাথে।'

'ওহ্!' থেমে গেল কণ্ঠস্বর। বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসা একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো দান্তে। তারপর আবার শোনা গেল কণ্ঠস্বর, 'আমি ভুল করে ফেলেছি। মারাত্মক ভুল! ভেবেছিলাম কারাগারের বাইরের দেয়ালের দিকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছি। কিন্তু হায়! তোমার কুঠুরির নিচে চলে এসেছে আমার সুড়ঙ্গ। ওহ!' আবার একটা দীর্ঘশ্বাস। 'আমার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল! আমি শেষ…'

'কী পরিকল্পনা করেছিলে তুমি?'

'কারাগারের বাইরের দিকের দেয়াল খুঁড়ে বেরিয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। কাছাকাছি কোনও দ্বীপে গিয়ে উঠতাম সাঁতার কেটে।'

'সবচেয়ে কাছের দ্বীপটাও বহু দূর এখান থেকে।'

'জানি। আশা করেছিলাম সময় মতো ঈশ্বর ঠিকই শক্তি দেবেন আমাকে। কিন্তু তা আর হবার নয়। সব ভেস্তে গেছে। সব শেষ।'

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো দান্তে।

'২৭ নম্বর।'

'এটুকুই! আর কোনও পরিচয় নেই তোমার? দয়া করে বলো! আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না? মহান যীশু খৃষ্টের নামে শপথ করে বলছি, কখনো তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না! বিশ্বাস করো আমাকে! বলো! আমাকে ছেড়ে যেও না! যদি যাও, সত্যিই বলছি, আমি আত্মহত্যা করবো…'

'বয়স কত তোমার?' জিজ্ঞেস করলো কণ্ঠস্বর।

'যখন এখানে আনে তখন বিশ ছিলো।'

'এত কম বয়সে!' করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠলো স্বরটা। 'ঠিক আছে, তোমাকে বিশ্বাস করছি। তোমার কাছে আসবো আমি।'

'কখন? বলো, বলো, কখন আসবে?'

'এক্ষুণি বলতে পারছি না। তবে কথা দিচ্ছি, আমি আসবো।'

'এসো! মিনতি করছি, এসো! আমাকে এখানে একা ফেলে রেখো না! শোনো! দু'জন একসাথে হলে আমরা হয়তো পালাতে পারবো। আর যদি পালাতে না-ও পারি দু'জন কথা বলতে পারবো। যাদের আমরা ভালোবাসতাম তাদের কথা আলাপ করবো। আমার বাবা এবং মার্সিডিসের কথা শোনাবো তোমাকে। তুমি বলবে তোমার কোনও প্রিয়জনের কথা…'

'আমি একা এই পৃথিবীতে।'

'না! ও কথা বোলো না! তুমি একা নও, এখন থেকে আমাকে পাবে। তুমি

যদি যুবক হও আমি তোমার ভাই হবো। যদি বৃদ্ধ হও, পুত্র হবো।'

'ঠিক আছে। আশা করি কাল তাহলে তোমার সাথে দেখা হবে।'

'কাল!' খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলো দান্তে।

গুড়ি মেরে নিজের কুঠুরিতে ফিরে এলো দান্তে। 'কাল,' বিড়বিড় করে বললো ও। 'কাল। কাল আসবে!'

সাবধানে দেয়ালের গর্তটা বন্ধ করে দিলো ও। রক্ষী হঠাৎ করে যেন কিছু টের পেয়ে না যায় সেজন্যে সাবধানতা হিসেবে খড়ের বিছানাটা এনে রাখলো তার পাশে। যেখানে গর্ত সে জায়গাটা প্রায় পুরোই ঢাকা পড়ে গেল বিছানায়। তারপর ধুলো বালি সব ঝেড়ে মুছে লুকিয়ে ফেললো এক কোনায়।

অসম্ভব খুশি লাগছে আজ দান্তের। বন্ধু আছে ওর! একজন হলেও আছে যার সাথে মন খুলে কথা বলতে পারবে। হয়তো… হয়তো পালাতেও পারবে দু'জন মিলে চেষ্টা করলে। আনন্দে হেসে উঠলো ও হা হা করে, যেন এতদিন পর সত্যিই, পাগল হয়ে গেছে। হঠাৎ অদ্ভুত এক ভয় হানা দিলো ওর মনে। থেমে গেল হাসি। রক্ষী যদি দেখে ফেলে গোপন সুড়ঙ্গটার মুখ? 'সেক্ষেত্রে ওকে খুন করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না আমার,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো দান্তে।

রাতের খাবার নিয়ে এলো রক্ষী। দেখলো দান্তে শুয়ে আছে। বিছানাটা যেখানে ছিলো এখন সেখানে নেই দেখে একটু আশ্চর্য হলো। দান্তের চোখে বুনো দৃষ্টি। ওকে ঘাঁটাতে সাহস করলো না রক্ষী। 'হ্যাঁ, আবার পাগল হয়ে যাচ্ছো তুমি। তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি।' শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

সে রাতটা জেগে কাটলো দান্তের। প্রতিমুহূর্তে আশা করেছে, এলো বুঝি লোকটা। কিন্তু না, বৃথাই রাত জাগলো দান্তের। এলো না সে।

পরদিন ভোরে, রক্ষী খাবার দিয়ে যাওয়ার একটু পরে দেয়ালের ওপাশ থেকে মৃদু একটা শব্দ ভেসে এলো। এক লাফে উঠে দাঁড়ালো দান্তে। হ্যাঁচকা টানে বিছানাটা সরিয়ে ফেলে সুড়ঙ্গমুখের পাথরগুলো খুলে আনতে লাগলো এক এক করে। তারপর গুড়ি মেরে ঢুকে গেল ভেতরে।

'বন্ধু, তুমি?' অত্যন্ত নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো ও। 'আমি এখানে; তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'রক্ষী এসেছিলো?'

'হ্যাঁ, খাবার দিয়ে চলে গেছে। রাতের আগে আর আসবে না।'

'বেশ। এখন তাহলে নিশ্চিন্তে কাজ শুরু করা যায়।'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! আমি আছি এখানে। অপেক্ষা করছি। আমার সাহায্য লাগলে বোলো।'

প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেছে। ক্রমশ কাছিয়ে আসছে শব্দ। আরো এক ঘণ্টা গেল। আরো কাছে, মনে হয় ঠিক পায়ের নিচে এসে পড়েছে শব্দ। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেছে দান্তের। আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে। বন্ধু আসছে! পরমুহূর্তে

শঙ্কায় পূর্ণ হয়ে গেল ওর মন। যদি রক্ষী এসে পড়ে? এ সময় কোনও দিন আসে না, কিন্তু আজ যদি এসে পড়ে? কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগলো দান্তে, 'ও ঈশ্বর! দয়া করো আমাদের। ও ঈশ্বর! দয়া করো, দয়া করো আমাকে! আমার বন্ধুকে নিরাপদে আসতে দাও! আমাকে একটা বন্ধু পেতে দাও, ঈশ্বর।'

এবার ঈশ্বর শুনলেন দান্তের প্রার্থনা। দু'ঘণ্টা পর দেয়ালের গর্তটার কাছে মেঝের মাটি ধসে পড়লো হঠাৎ। মানুষের একটা হাত উঠে এলো। তারপর একটা মাথা। এদিক ওদিক চাইছে সন্দিগ্ধ চোখে। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দান্তে ধরলো হাতটা। টেনে তুললো লোকটাকে। এক মুহূর্ত চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে, তারপর জাপটে ধরলো দু'হাতে।

'ও ঈশ্বর! ঈশ্বর! তুমি দয়াময়! তুমি দয়ার সাগর!' পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলো সে। আনন্দের অশ্রু দর দর ধারায় নেমে এসেছে গাল বেয়ে।

উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা একটু প্রশমিত হতেই লোকটাকে টেনে নিয়ে বিছানায় বসালো দান্তে। দু'চোখে অপার আগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো তার মুখ। এতক্ষণে খেয়াল করলো, কেমন জীর্ণ শীর্ণ আর ছোট লোকটার মুখ। চুলগুলো তুষার শুভ্র। সাদা আর কালোর মিশেল দেয়া দীর্ঘ দাড়ি। সে-ও কাঁদছে আনন্দের কান্না।

অনেক—অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলো দু'জন মানুষ। এ মুহূর্তে অনুভূতির গভীরতায় হারিয়ে গেছে ওদের ভাষা।

দশ

অবশেষে কথা বললো লোকটা, অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে, 'বন্ধু, খুব সাবধান হতে হবে আমাদের। না হলে রক্ষী হয়তো কোনও দিন দেখে ফেলবে সুড়ঙ্গটা।' বলে দান্তের আলগা করা পাথরগুলো পরীক্ষা করতে বসলো সে। খানিকক্ষণ পর বললো:

'যাচ্ছেতাইভাবে কেটেছো পাথরগুলো। কী দিয়ে?'

কলসির ভাঙা টুকরোটা দেখালো দান্তে।

'এর চেয়ে ভালো অস্ত্র আছে আমার কাছে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল দান্তের। 'কোথায় পেলে?'

'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। খাটের সঙ্গে লাগানো এক টুকরো লোহা খুলে বানিয়ে নিয়েছি। এই যে দেখ! এটা দিয়ে চল্লিশ ফুট লম্বা একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছি আমি।'

'চল্লিশ ফুট!' প্রায় চিৎকার করে উঠলো দান্তে।

'শ্‌শ্‌! অত জোরে না। কেউ শুনে ফেলবে। মনে রাখবে, কারাগারে দেয়ালেরও কান আছে।'

'এখানে আসার জন্যে চল্লিশ ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হয়েছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ভুল করে ফেলেছি আমি। মেঝেতে একটা বৃত্ত এঁকে দূরত্ব আর দিকের হিসেব করেছিলাম। একটু বড় হয়ে গেছিলো আমার বৃত্তটা। ফলে ওই হিসেব মতো যে সুড়ঙ্গ খুঁড়লাম তা এসে পড়েছে তোমার কুঠুরির নিচে, আসলে যাওয়া উচিত ছিলো বাইরের দেয়ালের দিকে।'

'আরো তিনটে দেয়াল আছে আমার কুঠুরির। ওগুলোর কোনও একটার নিচে দিয়ে খুঁড়ে হয়তো আমরা…'

'ওগুলোর একদিকে পাহাড়, ওদিক দিয়ে কোনও কাজ হবে না। এক দিকে গভর্নরের বাসা, ওদিক দিয়ে চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। আর অন্য দিকটা শেষ হয়েছে এমন এক জায়গায় যেখানে সতর্কভাবে পাহারা দেয় সৈনিকরা। রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা থাকে পাহারা। না! এখান থেকে পালানো অসম্ভব। তার মানে…' চুপ করে গেল বৃদ্ধ।

'তার মানে?' জিজ্ঞেস করলো দান্তে।

'তার মানে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিতে হবে সব। তাঁর ইচ্ছে হলে আমরা মুক্তি পাবো। ইচ্ছে না হলে পাবো না।'

প্রশংসার চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে দান্তে। পালানোর চেষ্টায় বছরের পর বছর এক মনে কঠোর পরিশ্রম করে এখন দেখছে খামোকা খেটেছে এতদিন—কিন্তু আশ্চর্য, তারপরও কেমন শান্ত নিরুদ্বেগ রয়েছে লোকটা!

'তোমার মতো লোক আর দেখিনি আমি,' বললো দান্তে, 'কেমন ধীর, স্থির, শান্ত, বোধহয় সাহসীও। কে তুমি?'

'আমি তোমাকে কোনও রকম সাহায্য করতে পারবো না, তবু জানতে চাও?'

'পারবে না বলছো কেন? এখনই তো তুমি আমাকে সাহায্য করছো। তোমার উদাহরণ, তোমার সাহস, তোমার ধৈর্য আমার মনোবল বাড়াতে সাহায্য করবে। এখন এছাড়া তো আর কিছু চাইবার নেই আমার।'

'তাহলে শোনো,' মৃদু একটু দুঃখ মেশানো হাসি হেসে লোকটা বললো, 'আমার নাম ফারিয়া। জন্মসূত্রে ইতালীয়। এবং তোমার মতো আমিও একজন রাজনৈতিক বন্দী। এগারো বছর ধরে আছি এখানে। সেই '১১ সাল থেকে।'

'কেন তোমাকে বন্দী করা হয়েছে?'

'ইতালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে একজন মাত্র রাজার অধীনে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলাম। পরামর্শটা দিয়েছিল নেপোলিয়ন। সে কারণে আমি নেপোলিয়নের পক্ষে ছিলাম। তারপর আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো আমারই দলের লোক কয়েকজন, যাদের বিশ্বাস করেছিলাম।' করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফারিয়া।

'ইতালির জন্যে সব কিছুর ঝুঁকি নিয়েছিলে তুমি!'

'হ্যাঁ, ইতালির জন্যে—সবকিছুর।' অহঙ্কার বৃদ্ধের গলায়। ধীরে ধীরে দান্তের বিছানায় বসে পড়লো সে।

দান্তে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি সেই অসুস্থ বন্দী না?'

'অসুস্থ মানে? পাগল তাই তো বলতে চাইছো, না কী?'

'আঁ…হ্যাঁ, ওরা তেমনই বলেছিলো বটে।'

'ওরা ভাবে আমি পাগল,' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো ফারিয়া। 'মানুষের ভাবনায় তো আমার হাত নেই।'

নিঃশব্দে বসে রইলো দু'জন।

অনেকক্ষণ পর দান্তে নীরবতা ভাঙল। 'আবার পালানোর চেষ্টা করবে তুমি?'

এপাশে ওপাশে মাথা নাড়ল ফারিয়া। 'না, তা আর সম্ভব নয়। আমি শেষ হয়ে গেছি। সম্ভবত ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় আমি এখান থেকে বের হই। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক নয়।'

'কিন্তু আরেকবার চেষ্টা করলে হয়তো…'

মুখ তুলে জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো ফারিয়া দান্তের দিকে। হঠাৎ হেসে ফেলে মাথা নাড়লো সে।

'নাহ, আমার দ্বারা আর সম্ভব নয়। তুমি জানো, শুধু যন্ত্রপাতি তৈরি করতে আমার কতদিন লেগেছিল? চার বছর! তারপর দু'বছর ধরে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছি। কখনও কখনও সারারাত কাজ করেছি। কদ্দূর এগিয়েছি জানো? হয়তো এক ইঞ্চি। পুরো এক রাতে এক ইঞ্চি এগিয়েছি! ভাবতে পারো! অসম্ভব ভারি ভারি পাথর সরিয়েছি, স্বাভাবিক সময় সেগুলো নড়ানোর কথা হয়তো ভাবতেও পারতাম না। একটা আস্ত কুয়ো খালি করতে হয়েছে পাথর, ধুলো বালি রাখার জন্যে। সেই কুয়ো এখন ভর্তি। আবার চেষ্টা করা মানে আবার গোড়া থেকে শুরু করা। না, বন্ধু, আমি শেষ হয়ে গেছি। আবার গোড়া থেকে শুরু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।' এক মুহূর্ত থামলো সে। তারপর যোগ করলো, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ-ই, আমি কী করবো?'

মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনলো দান্তে। একটা মানুষ যার বয়েস ওর চেয়ে অনেক বেশি, যার শরীর এত দুর্বল সে এত কিছু করেছে! নতুন করে আশার সঞ্চার হলো তার মনে। ওর বয়েস অনেক কম, গায়েও শক্তি বেশি ফারিয়ার চেয়ে। ও-ও কেন একবার চেষ্টা করে দেখবে না? চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলো দান্তে। তারপর বললো—

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তোমার সুড়ঙ্গের একটা অংশ নিশ্চয় বাইরের পথের কাছে।'

'হ্যাঁ… প্রায় পনেরো ফুট ওপাশে।'

'ওখান থেকে তো আমরা নতুন একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে পারি পথের দিকে। পাহারায় থাকবে যে সৈনিক তাকে অনায়াসে আমি খুন করতে পারবো। তারপর পালাবো দু'জন। তোমার আছে সাহস আর আমার শক্তি। দু'টোর মিলিত প্রচেষ্টায়…'

'না, না!' বাধা দিলো ফারিয়া। 'তুমি বুঝতে পারছো না, বন্ধু। সুড়ঙ্গ কাটাটা কোনও সমস্যা নয়; সমস্যা হচ্ছে মানুষ কাটা। না! আমি মানুষ খুন করতে পারবো না। কিছুতেই না!'

'খুন করার ভয়ে এই নরকে পচে মরবে!'

'হ্যাঁ! মানুষ খুনের চেয়ে ভয়ানক আর কিছু নেই। নেকড়ে বা ভালুক হয়তো মারতে পারে, কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষ খুন! অসম্ভব!'

চুপ করে গেল দান্তে। আসলে ওর মনের কথাই প্রকাশ করে দিয়েছে ফারিয়া।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলো দু'জন। তারপর ফারিয়া বললো, 'আমার কথা তো মোটামুটি শুনলে, এবার তোমার কাহিনি শোনাও।'

'আমি কোনও অপরাধ করিনি,' শুরু করলো দান্তে। তারপর গড় গড় করে বলে গেল মার্সেই-এ পৌঁছার পর থেকে শ্যাতো দ্'ইফ-এ আসা পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব।

নিঃশব্দে শুনলো ফারিয়া। দান্তে শেষ করতে জিজ্ঞেস করলো, 'বলছো ফারাও-এর ক্যাপ্টেন হতে যাচ্ছিলে, এসময় তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়?'

'হ্যাঁ।'

'এবং সুন্দরী এক যুবতীর স্বামী হতে যাচ্ছিলে সেসময়?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা ভেবে দেখ তো, জাহাজে এমন কেউ কি ছিলো যে তোমার শত্রুতা করতে পারে?'

কিছুক্ষণ ভাবলো দান্তে।

'হ্যাঁ, একজন ছিলো। তার নাম দাঁগলার, জাহাজের মালপত্র সব ওর দায়িত্বে থাকতো। কেন জানি না লোকটা দেখতে পারতো না আমাকে। একবার তো ওর সাথে ঝগড়াই হয়ে গেছিলো আমার, ডুয়েল লড়তে চেয়েছিলাম—ও সাড়া দেয়নি।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালো ফারিয়া। 'এখন একটু একটু বুঝতে পারছি। তুমি ক্যাপ্টেন হয়ে ওকে জাহাজে রাখতে?'

'হয়তো। খুব ভালো নাবিক ও।'

'আচ্ছা, এবার বলো দেখি, তোমার সাথে ক্যাপ্টেন লেক্লার্কের শেষ আলাপ কেউ শুনেছিলো?'

'না। কেবিনে আমরা দু'জনই শুধু ছিলাম।'

'আড়াল থেকে কেউ শুনেছিলো?'

'ঠিক জানি না। শোনা অসম্ভব না, দরজা খোলা ছিলো। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ক্যাপ্টেন লেক্লার্ক যখন আমার হাতে চিঠিটা দিচ্ছিলেন তখন দাঁগলারকেই দেখেছিলাম দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছে।'

হাসলো ফারিয়া।

'ধরো ক্যাপ্টেন লেক্লার্ক মারা যাওয়ার পর তুমি চাকরি ছেড়ে দিলে, তখন কে হবে ফারাও-এর ক্যাপ্টেন?'

'বাইরে থেকে যদি কাউকে না আনা হয় অবশ্যই দাঁগলার।...আপনি বলতে চাইছেন...!' থেমে গেল দান্তে।

মাথা ঝাঁকালো বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ, তোমার আটকা পড়ার পেছনে দাঁগলারের হাত আছে। কোন সন্দেহ নেই আমার।'

চমকে উঠলো দান্তে। সেই মুহূর্তে একটা বীজ অঙ্কুরিত হলো ওর মনে—প্রতিশোধের বীজ।

'এবার বলো,' বলে চললো ফারিয়া, 'মার্সিডিসের সাথে তোমার বিয়েটা ঠেকাতে চাইছিলো এমন কেউ ছিলো?'

'ঠিক জানি না। তবে লোক মুখে শুনেছিলাম। ফার্নান্দ মন্তেগো নামের এক লোক—মার্সিডিসেরই খালাতো ভাই—সে-ও নাকি ওকে ভালোবাসতো।'

'দাঁগলার চিনতো ফার্নান্দকে?'

'না—হ্যাঁ, চিনতো! মনে আছে, বিয়ের আগের দিন বিকেলে দু'জনকে একসাথে মদ খেতে দেখেছিলাম এক ক্যাফেতে। কাদেরুশে নামের একজন-ও ছিলো ওদের সাথে। আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতো কাদেরুশে। পুরো মাতাল হয়ে গিয়েছিলো সে তখন; চেয়ারে বসে থাকবে তা-ই পারছিলো না।' একটু থামলো দান্তে। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'উহ! বদমাশের দল! কখনো কল্পনাও করিনি, এ কাজ ওদের হতে পারে!'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে।' শান্ত বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর। 'যে বিচারক তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো তার নামটা কী যেন?'

'মঁসিয়ে দ্য ভিলফোর্ত।'

'বয়স কেমন ছিলো তখন ওর? যুবক না বৃদ্ধ?'

'ছাব্বিশ সাতাশ হবে। আমার পক্ষে ছিলেন ভদ্রলোক—।'

'কী করে জানলে?'

'আমার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ ছিলো ক্যাপ্টেন লেক্লার্কের চিঠিটা, সেটা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন উনি।'

'তাই কী? কাকে লেখা হয়েছিলো চিঠিটা?'

'জনৈক মঁসিয়ে নোয়ারতিয়েরকে। ঠিকানা, ১৩ রু কক হেরোঁ, প্যারিস। আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন বিচারক, জীবিত কারো কাছে কখনো প্রকাশ করবো না নামটা।'

'তা তো করাবেই,' বলে হা-হা করে হেসে উঠলো ফারিয়া।

অবাক চোখে দান্তে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। অস্থিরভাবে প্রশ্ন করলো, 'কী ব্যাপার, হাসছো কেন এমন?'

'প্রিয় বন্ধু,' জবাব দিলো বৃদ্ধ, 'নোয়ারতিয়ের নামের এক লোককে আমি চিনতাম এককালে—সে ছিলো নেপোলিয়নের অনুসারী। তার পুরো নাম নোয়ারতিয়ের দ্য ভিলফোর্ত। কোনও সন্দেহ নেই, এরই ছেলে তোমার ওই বিচারক ভিলফোর্ত, এবং সে-ই তোমাকে পাঠিয়েছে শ্যাতো দ্'ইফ-এ।'

আর্তনাদের মতো একটা আওয়াজ বেরোলো দান্তের গলা দিয়ে। মঁসিয়ে নোয়ারতিয়ের-এর নাম শুনে কেমন চমকে উঠেছিলো ভিলফোর্ত মনে পড়ে গেল। মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে গেল, কেন চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেছিলো সে, কেন আর কোনও জিজ্ঞাসাবাদ বা শুনানি ছাড়াই ওকে শ্যাতো দ্'ইফ-এ পাঠিয়ে দেয়া

হয়েছে।

হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বার বার দেয়ালে ঘুসি মেরে চললো দান্তে। মাথার ভেতর হাতুড়ির ঘা-এর মতো আঘাত করছে তিনটে নাম—দাঁগলার! ফার্নান্দ! ভিলফোর্ত!

অনেকক্ষণ লাগলো দান্তের শান্ত হতে।

'এ নিয়ে ভাবতে হবে আমাকে,' বললো ও, 'আমি একটু একা থাকতে চাই।'

উঠে দাঁড়ালো ফারিয়া। দান্তের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আশা করি কাল নাগাদ ভালো বোধ করবে তুমি। কাল আমার কুঠুরিতে এসো।'

মাথা ঝাঁকালো দান্তে। ফারিয়া গুড়ি মেরে মেঝের সুড়ঙ্গের ভেতর নেমে পড়লো। তারপর অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইলো দান্তে। শরীরটা স্থির কিন্তু মনটা ভীষণ ব্যস্ত ওর। এতগুলো বছর ভেবেও যে রহস্যের কিনারা করতে পারেনি আজ আধঘণ্টার ভেতরেই তার সমাধান করে দিয়ে গেছে ফারিয়া। দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করলো দান্তে, যদি কোনও দিন সুযোগ আসে প্রতিশোধ নেবে ও! ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!

এগারো

পরদিন সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ফারিয়ার কুঠুরিতে গেল দান্তে। চোখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকালো। একটু যেন হতাশ হলো। বিস্ময়কর কিছু দেখবে আশা করেছিলো, কিন্তু না, ওর কুঠুরির সঙ্গে বলতে গেলে কোনও পার্থক্যই নেই। হতাশ ভঙ্গি সত্ত্বেও ওর চোখে আজ এমন কিছু দেখতে পেলো বৃদ্ধ যা কাল পায়নি।

'আমি খুবই দুঃখিত,' বললো সে, 'শত্রু চিনতে সাহায্য করেছি তোমাকে।'

'তাতে দুঃখ পাওয়ার কী হলো?'

'তোমার মনের শান্তি নষ্ট হয়েছে। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে না তোমার মনে?'

তিক্ত হাসি হাসলো দান্তে। কিছু বললো না।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো দু'জন। তারপর দান্তে বললো, 'তোমার সুড়ঙ্গ দেখলাম। বোঝা যায় কি ভয়ানক খাটতে হয়েছে। নিশ্চয়ই মাঝে মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়তে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধা হয়নি। সহজেই মন ভালো করে ফেলতে পারি আমি।'

'কী করে?'

'পড়ালেখা।'

'পড়ালেখা! তার মানে ওরা তোমাকে বই, কাগজ-কলম দিয়েছে?'

'না। আমি নিজে তৈরি করে নিয়েছি।'

বিস্মিত চোখে বন্ধুর দিকে তাকালো দান্তে।

'এখানে বসে যে বইখানা লিখেছি সেটা তোমাকে দেখাবো,' ফারিয়া বললো। 'ইতালির ইতিহাস।'

'ইতালির ইতিহাস! ও জিনিস লিখতে হলে তো অনেক বই-এর সাহায্য দরকার।'

'যা যা দরকার সব আমার মাথার ভেতরে আছে। এখানে আসার আগে অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি লেখাপড়া করে।'

'তুমি ইতালীয়, কথা বলছো ফরাসিতে। অনেকগুলো ভাষা জানো নিশ্চয়ই?'

'পাঁচটা। এখন আমি আধুনিক গ্রীক-এর চর্চা করছি। হাজারখানেক শব্দ লিখতে পারলেই সন্তুষ্ট বোধ করব। হাজারখানেক শব্দ জানলে মোটামুটি কাজ চালানোর মতো কথা বলা যায়।'

দান্তের কাছে মনে হলো, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী এক মানুষ ফারিয়া। তার তুলনায় ও নিজে রীতিমতো অশিক্ষিত মূর্খ।

'কলম তৈরি করেছো কী করে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'মাছের কাঁটা দিয়ে। প্রথম যেদিন ওরা আমাকে মাছ খেতে দিলো সেদিন যে কী খুশি হয়েছিলাম! একবার মাছ দেয়ার অর্থ কয়েকটা নতুন কলম...' থামলো ফারিয়া। তারপর বলে চললো, 'ওই ইতিহাস লেখার ব্যাপারটা প্রচুর আনন্দ দিয়েছে আমাকে। অতীতের কথা লিখতে গিয়ে একদম ভুলে গিয়েছি বর্তমানকে। ভুলে গিয়েছি আমি শ্যাতো দ্'ইফ-এর কয়েদী।'

'তোমার বইটা দেখাবে আমাকে?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলো দান্তে।

'নিশ্চয়ই। যখন তোমার ইচ্ছা।'

'এখনি দেখবো আমি!'

'বেশ, তাহলে বসো। চিন্তার কোনও কারণ নেই, প্রচুর সময় আছে আমাদের হাতে। এখন মাত্র বারোটা দশ বাজে।'

'বারোটা দশ!' বিস্ময়ের পরে বিস্ময়। 'এত নিখুঁত ভাবে সময় জানলে কী করে?'

'ওই যে ওখানে দেখ,' দেয়ালের এক জায়গায় অনেকগুলো দাগ দেখিয়ে ফারিয়া বললো, 'ওটা আমার ঘড়ি। জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ছে দাগের ওপর। কোন দাগের ওপর পড়ছে দেখে জেনে নিচ্ছি সময়।' তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, 'আগে তাহলে ইতিহাসটাই দেখবে?'

'হ্যাঁ।'

কুঠুরির এক কোণে চলে গেল ফারিয়া। বড় একটা পাথর উঁচু করে বড় বড় কয়েক টুকরো কাপড় বের করে আনলো।

'এটা আমার গ্রন্থাগার,' মৃদু হেসে ব্যাখ্যা করলো সে। কাপড়গুলো দান্তের হাতে দিতে দিতে বললো, 'এই যে আমার ইতালির ইতিহাস। আমার সব কাপড় নিয়ে নিয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত ওটা শেষ করতে পেরেছি ভেবে খুশি

আমি।'

কাপড়গুলোর ওপর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখাগুলো দেখতে লাগলো দান্তে। অপার বিস্ময় দু'চোখে।

এরপর ফারিয়া তার কলমগুলো দেখালো। ভাঙা লণ্ঠনের টুকরো দিয়ে বানানো একটা ছুরি। একই রকম মুগ্ধ চোখে দেখলো দান্তে।

'এত কিছু করার সময় পেলে কখন?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'দিনে তো বটেই রাতেও কাজ করেছি। কখনো কখনো সারারাত।'

'রাতে দেখেছো কী করে?'

'একটা প্রদীপ বানিয়ে নিয়েছি। এই যে দেখ!' দান্তেকে প্রদীপটা দেখালো ফারিয়া।

'তেল পাও কোথায়?'

'ওরা যে খাবার দেয় তা থেকে। যদিও খুব ভালো জ্বলে না, তবে আমার কাজ চলে যায়।'

অনেকক্ষণ বসে গল্প করলো দু'বন্ধুতে। ফারিয়ার সাথে যত আলাপ করছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে দান্তে। দুনিয়ার বিচিত্র বিচিত্র সব বিষয়ে লোকটার এমন অগাধ জ্ঞান, বিশ্বাসই করা যায় না। দান্তে খুব বেশি লেখাপড়া করেনি—যতটুকু না করলে নয় ততটুকু—ফলে ফারিয়ার অনেক কথাই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ওর।

'তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আমার,' শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো দান্তে। 'তোমার সাথে আলাপ করে বুঝতে পারছি, কেমন অজ্ঞ আমি। আর তুমি, রীতিমতো পণ্ডিত। আমি খুব ভালো সঙ্গী হতে পারবো না তোমার। অবশ্য আমাকে যদি তুমি শিখিয়ে পড়িয়ে নাও তাহলে অন্য কথা। শেখাবে আমাকে?'

হাসলো ফারিয়া। 'কেন নয়? অবশ্য খুব বেশি কিছু আমি জানি না। যাহোক, যা জানি তা-ই তোমাকে শেখাবো। খুশি মনেই শেখাবো। একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকলে কারাগারের যন্ত্রণা ভোলা সহজ হবে।'

'তাহলে কখন শুরু করছি আমরা?' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো দান্তে।

'তুমি চাইলে এখনই।'

সেদিন থেকেই নতুন জীবন শুরু হলো দান্তের। কী কী শিখবে, কোনটার পর কোনটা, তার একটা ছক তৈরি করে ফেললো দু'জন। পরদিন থেকে শুরু হলো ছাত্র জীবন। মেধাবী লোক দান্তে। দ্রুত শিখে নিতে লাগলো ও। ভাষা দিয়ে আরম্ভ। ফরাসি ছাড়া ইতালীয় ভাষা কিছু কিছু জানে দান্তে। কিন্তু ছ'মাস পরে দেখা গেল স্পেনীয়, ইংরেজি এবং জার্মান ভাষাও বলতে পারে ও।

তারপর শুরু হলো ইতিহাস, গণিত এবং বিজ্ঞান। সময়ের স্থবির চাকা গতি পেলো যেন। কোনদিক দিয়ে যে তিনটে বছর পেরিয়ে গেল টেরই পেলো না কেউ। এর মধ্যে সাধারণ নাবিক দান্তে নতুন মানুষে পরিণত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরো নতুন নতুন শাখায় পদচারণা শুরু হলো ওর। একই গতিতে উড়ে চললো সময়।

কিছুদিন ধরে একটা ব্যাপার খেয়াল করছে দান্তে, মাঝে মধ্যেই কেমন যেন

আনমনা হয়ে যায় ফারিয়া। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা যেন খোঁচাচ্ছে ওকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুঠুরির ভেতর পায়চারি করে কাটায়। আগ্রহ করে কিছু একটা শিখতে গেল দান্তে; ও বলে দিলো, এখন নয় রাতে বা কাল। এই ব্যাপারটাই বেশি অবাক করছে দান্তেকে। ক'দিন আগেও শেখানোর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অনীহা দেখেনি ও ফারিয়ার ভেতর। এই ক'দিনে কী এমন হলো? জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলো না।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে চিৎকার করে উঠলো ফারিয়া, 'ওহ্, বাইরের ওই পথটায় যদি পাহারা না থাকতো…'

'…তাহলে হয়তো আমরা পালাতে পারতাম।' অসমাপ্ত বাক্যটা সম্পূর্ণ করলো দান্তে। এতদিনে বুঝতে পারলো ও, কী নিয়ে বিচলিত হয়ে আছে ফারিয়া। সেই পুরনো প্রস্তাবটাই আবার রাখলো, পাহারাদারকে খুন করতে তৈরি আছে ও।

'না! না! না! ওকথা বোলো না!' ভীতস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো ফারিয়া।

'বেশ, তাহলে খুন করবো না, পেছন থেকে আক্রমণ করে বেঁধে ফেলবো ওকে।'

'আঁ, হ্যাঁ…তা হতে পারে। ঠিক আছে আরেকবার চেষ্টা করে দেখবো আমরা।'

বারো

পরদিন নতুন সুড়ঙ্গটা খুঁড়তে শুরু করলো দুই বন্দী। প্রথমে আন্দাজ করে নিলো বাইরের পথটা কোন দিকে, তারপর পুরনো সুড়ঙ্গের প্রায় মাঝামাঝি জায়গা থেকে শুরু করলো খোঁড়া। সকাল এবং সন্ধ্যায় যে সময় খাবার দিয়ে যায় রক্ষী সেই সময়টুকু ছাড়া সারাদিন কাজ করে চললো ওরা। যে মাটি বেরোচ্ছে সেগুলো ঝুরো করে রেখে দেয়। শুকিয়ে গেলে গভীর রাতে দুজনে মিলে নিয়ে আসে কোনও এক কুঠুরিতে। দুই কুঠুরিরই ছাদের ঠিক নিচে একটা করে ছোট্ট জানালা আছে। একজন আরেকজনের কাঁধে চড়ে সেখান দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় শুকনো প্রায় ধুলোর মতো মাটি।

একদিন দু'দিন করে কয়েকমাস চলে গেল। অবশেষে প্রায় শেষ হলো নতুন সুড়ঙ্গের কাজ। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার কাজ বাকি। ওটুকু শেষ করতে পারলেই ওরা বেরিয়ে যেতে পারবে শ্যাতো দ্'ইফ-এর বাইরে। পরবর্তী অমাবস্যার রাতের অপেক্ষা করতে লাগলো দান্তে আর ফারিয়া। গভীর রাতে শেষ খননটুকু চালাবে। তারপর মুক্তি! উত্তেজনায় টগবগ করছে দান্তে। ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, প্রয়োজন হলে খুন করবে বাইরের প্রহরীকে। তারপর কিছু একটা ব্যাখ্যা দেয়া যাবে ফারিয়াকে।

হিসেবনিকেশ করে নিশ্চিত হয়েছে ওরা, আগামীকাল অমাবস্যা। রাতে চাঁদ

থাকবে না। মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে দু'জন। দু'জনই এখন দান্তের কুঠুরিতে। শেষবারের মতো একবার দান্তে দেখতে গেল নতুন সুড়ঙ্গের শেষ মাথাটা। মনে মনে ভাবছে, হিসেবের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে নেবে না তো শেষটুকু খুঁড়তে?

হঠাৎ চাপা একটা আর্তনাদের আওয়াজ ভেসে এলো ওর কানে। গলাটা চিনতে ভুল হয়নি। ফারিয়া! কী হয়েছে ফারিয়ার? অসময়ে রক্ষী এসে দান্তের কুঠুরিতে আবিষ্কার করেছে ওকে? পড়িমরি করে ফিরে আসতে লাগলো দান্তে।

নিজের কুঠুরির ঠিক বাইরে পৌঁছে সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখলো। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক থেকে। না রক্ষী আসেনি। ফারিয়া একা দাঁড়িয়ে আছে কুঠুরিতে। কিন্তু ও কী! টলছে কেন ফারিয়া? ওর মুখটা অমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন?

'ফারিয়া! বন্ধু!' চিৎকার করে ছুটে এলো দান্তে। 'কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?'

'সব শেষ, দান্তে,' বললো ফারিয়া। অসম্ভব দুর্বল শোনালো ওর কণ্ঠস্বর। 'আমার মৃত্যু আর খুব দূরে নেই।··· সেই অসুখটা, আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।'

সাবধানে ধরে ধরে বন্ধুকে বিছানার কাছে নিয়ে বসিয়ে দিলো দান্তে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলো ফারিয়া। দান্তের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আগেও একবার এমন হয়েছিলো। এখানে আসার বছরখানেক আগের কথা সেটা। এখন একটাই করণীয় আছে। তাড়াতাড়ি আমার কুঠুরিতে যাও। আলগা পাথরটার নিচে লাল তরল পদার্থের একটা শিশি আছে। ওটা নিয়ে এসো।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো দান্তে। গুড়ি মেরে সুড়ঙ্গে ঢুকতে যাবে, এমন সময় বাধা দিলো ওকে ফারিয়া। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'না! আমিই যাচ্ছি। আমার এখানে থাকা ঠিক হবে না। ওরা যদি আমাকে এখানে দেখে তুমি বিপদে পড়ে যাবে। তার চেয়ে এসো, আমাকে একটু ধরো। সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকতে সাহায্য করো।'

ঠিকই বলেছে ফারিয়া। দান্তে ফিরে এলো। ফারিয়াকে ঢুকতে সাহায্য করলো সুড়ঙ্গে। নিজেও ঢুকলো। তারপর গুড়ি মেরে ধরে ধরে নিয়ে চললো বৃদ্ধকে। ফারিয়ার কুঠুরিতে পৌঁছে আস্তে করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলো বিছানায়।

ইতোমধ্যে আরো খারাপ হয়েছে ফারিয়ার অবস্থা। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। চোখ মুখ কুঁচকে ব্যথা সহ্য করছে।

'ধন্যবাদ, বন্ধু,' অনেক কষ্টে বললো ফারিয়া। তারপর শুয়ে রইলো চোখ বুজে। অনেকক্ষণ পর, একটু শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে আবার কথা বললো সে: 'আমার এই অসুখের নাম ক্যাটালেপসি। খুব শিগগিরই যন্ত্রণায় উন্মাদের মতো চিৎকার করবো আমি, তারপর মরার মতো পড়ে থাকবো, নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকবে না।' আবার চুপ করলো ফারিয়া। একটু পরে বললো, 'সাবধানে শোনো, যা বলছি সেই মতো করবে, ওই শিশিটা এনে কাছে রাখো, চিৎকারের পর যখন

শান্ত হবো গুণে গুণে দশ ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দেবে আমার মুখে। এ যাত্রা বেঁচে যেতেও পারি…'

'তুমি মরবে না, বন্ধু, আমি তোমাকে মরতে দেবো না,' আবেগজড়িত কণ্ঠে বললো দান্তে।

কথাটা শেষও করতে পারলো না দান্তে, আচমকা তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো ফারিয়া। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল ওর মুখ। কাটা মুরগির মতো তড়পাতে তড়পাতে বিছানায় গড়াগড়ি করতে লাগলো। সেই সাথে ভয়ানক চিৎকার। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো, এক টুকরো কাপড় দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরতে বাধ্য হলো দান্তে। ব্যথার উপশম হোক না হোক, ওর চিৎকার পৌঁছুবে না বাইরে। এই অমানুষিক চিৎকার শুনে যদি রক্ষী হাজির হয় তাহলেই মুশকিল। রক্ষী এলে দান্তে থাকতে পারবে না এখানে। আর ও এখানে না থাকলে ফারিয়াকে ওষুধ খাওয়াবে কে?

প্রায় ঘণ্টাখানেক একটানা চিৎকার, গড়াগড়ি করলো ফারিয়া। তারপর ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়লো। প্রথমে চিৎকার বন্ধ হলো, তারপর গড়াগড়িও। সত্যিই, যেমন বলেছিলো তেমন মরার মতো পড়ে রইলো ফারিয়া।

ওষুধের শিশিটা তুলে নিলো দান্তে। গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে আঙুল দিয়ে হাঁ করালো ফারিয়াকে। গুণে গুণে দশ ফোঁটা ওষুধ সাবধানে ঢেলে দিলো তার মুখে। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ফলাফল দেখার জন্যে। যত প্রার্থনাবাক্য জানা আছে সব আওড়াচ্ছে মনে মনে।

এক ঘণ্টা কেটে গেল, কোনও পরিবর্তন হলো না ফারিয়ার অবস্থার। যেমন ছিলো তেমনই শুয়ে আছে। অনড়। চোখ দুটো খোলা, স্থির তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। মরে গেছে নাকি?—ভয়ে ভয়ে একবার ভাবলো দান্তে। ঝুঁকে তাকিয়ে রইলো বন্ধুর মুখের দিকে। ইস! একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ফারিয়াকে! সত্যিই যদি মরে যায়? কথাটা মনে আসতেই আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলো দান্তে, 'না! না! না!' দুচোখ থেকে দরদর করে নেমে এলো অশ্রু।

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ বলতে পারবে না দান্তে, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক রঙ ফিরে এলো ফারিয়ার মুখে। চোখের ঘোলাটে ভাব একটু কমলো। তারপর নড়ে উঠলো ফারিয়া!

'বেঁচে আছে! বেঁচে আছে!' খুশিতে চিৎকার করে উঠলো দান্তে। 'ওহ্, ঈশ্বর, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো!'

জ্ঞান ফিরে এলেও অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলো না ফারিয়া। অবশেষে একটা কম্পিত হাত তুলে দরজার দিকে ইশারা করলো। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বাইরে। রক্ষী আসছে!

লাফিয়ে উঠে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো দান্তে। গর্তের মুখে সাজিয়ে দিলো পাথরগুলো। তারপর দ্রুত চলে এলো নিজের কুঠুরিতে। সুড়ঙ্গের মুখের পাথরগুলো সবেমাত্র সাজিয়ে বিছানায় উঠতে পেরেছে কি পারেনি, রক্ষী ঢুকলো কুঠুরিতে। রাতের খাবার নিয়ে এসেছে। বন্দীকে বিছানায় দেখলো সে। মুখ

ফেরানো দেয়ালের দিকে। সাধারণত ওভাবেই শুয়ে থাকে দান্তে। কোনও কথা বললো না রক্ষী। ওর দিকে একবার তাকিয়ে খাবারগুলো টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেল।

দরজায় তালা লাগানোর শব্দ শুনলো দান্তে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ও। দ্রুত আবার ফিরে এলো ফারিয়ার কুঠুরিতে। একটু সুস্থ দেখাচ্ছে বৃদ্ধকে, যদিও এখনো খুব দুর্বল।

'ভাবিনি আবার তোমার দেখা পাবো,' অনেক কষ্টে ফারিয়া উচ্চারণ করলো।

'কেন? ভেবেছিলে তার আগেই মরে যাবে?'

'না। ভেবেছিলাম তুমি পালাবে। সব কিছু তৈরি…'

'সত্যিই তুমি তাই ভেবেছিলে! আমি পালাবো, তোমাকে এখানে ফেলে…?'

'আমাকে মাফ করে দাও, পুত্র! আমি ভুল ভেবেছিলাম। হঠাৎ করে অসুখটা হামলা করায় এমন দুর্বল বোধ করছিলাম…'

'থাক, চিন্তা কোরো না। আবার তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।' বৃদ্ধের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া হাতগুলো ডলে দিতে লাগলো দান্তে।

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?' করুণ একটু হেসে ফারিয়া বললো। 'প্রথমবার যখন অসুখটা হামলা করেছিলো, আধ ঘণ্টার ভেতর সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। এবার তো তুমি নিজেই দেখলে, অনেক বেশি সময় ভুগেছি। এখনো ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। আরো দুঃসংবাদ, ডান দিকের হাত পা নাড়তে পারছি না। পরের আক্রমণেই মারা যাবো আমি, কোনও সন্দেহ নেই… নয়তো অবশ হয়ে যাবে সারা শরীর… নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকবে না।'

'ওসব কথা রাখো তো, আমি বলছি আবার তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, শরীরে শক্তি ফিরে পাবে। আমরা দু'জনে পালাবো। তোমার অসুখ পরের বার যখন আক্রমণ করবে তখন তুমি মুক্ত। ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে।'

হাসলো আবার ফারিয়া। 'পালানো আমার ভাগ্যে নেই, এডমণ্ড। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখন হাঁটতে পারবো কিনা সে ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে!'

'না পারলে নাই। আমরা অপেক্ষা করবো। এক সপ্তা, দু'সপ্তা, যখন তুমি শক্তি ফিরে পাবে তখন চেষ্টা করবো।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু আমি সাঁতার কাটতে পারবো না যে! এই হাতটা নাড়াতে পারছি না একদম। একটুও শক্তি নেই এতে। বিশ্বাস না হয় তুলে দেখ…'

আস্তে উঁচু করলো দান্তে বৃদ্ধের ডান হাতটা। ছেড়ে দিতেই গাছের মরা ডালের মতো পড়ে গেল।

'এবার বিশ্বাস হচ্ছে?' করুণ গলায় বললো ফারিয়া। 'এই হাতটা আর কোনও দিন ব্যবহার করতে পারবো না।'

'আমি তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যাবো।'

'বাপ, তুমি নাবিক, ভালো সাঁতারু। আমাকে পিঠে নিয়ে একশো গজের

বেশি যে সাঁতরে যেতে পারবে না তা তোমার চেয়ে ভালো কে জানে? খামোকা আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছো। আমার অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারছি।' থামলো বৃদ্ধ। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললো, 'যতদিন না ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দেন, ততদিন আমি এখানেই থাকবো। মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র মুক্তির পথ...' আবার থামলো সে। 'শোনো, বাপ, তোমার বয়েস কম, শক্তিও আছে গায়ে। তুমি পালাও। যাও! চলে যাও! সব কিছু তৈরি! এমন সুযোগ আর পাবে না!'

উঠে দাঁড়ালো দান্তে। শান্ত গম্ভীর স্বরে বললো, 'বন্ধু! আমি শপথ করে বলছি, তোমাকে রেখে আমি কোথাও যাবো না।' হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসছে যেন দান্তের কথাগুলো। 'কক্ষনো না। তুমি এখানে ধুঁকে ধুঁকে মরবে আর আমি মুক্ত পৃথিবীতে হেসেখেলে বেড়াবো! অসম্ভব! একমাত্র মৃত্যুই আমাদের আলাদা করতে পারে। আমি এখানেই থাকছি।'

অদ্ভুত এক ভালোবাসার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ফারিয়ার মুখ। দু'চোখ ভরে উঠলো জলে।

'ধন্যবাদ, এডমণ্ড,' বললো সে। 'তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু, আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। কতখানি কৃতজ্ঞ একদিন তুমি বুঝতে পারবে। এখন যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল সকালে আসবে। জরুরি কিছু কথা বলবো তোমাকে।'

তেরো

পরদিন ভোরে রক্ষী খাবার দিয়ে চলে যাওয়ার পরপরই ফারিয়ার কুঠুরিতে হাজির হলো দান্তে। উদ্বিগ্ন চোখে তাকালো বৃদ্ধের দিকে। বললো, 'আজ একটু ভালো দেখাচ্ছে তোমাকে।'

এ কথার কোনও জবাব দিলো না ফারিয়া। করুণ একটু হাসলো শুধু। এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলো দান্তের দিকে।

'এটা পড়ে দেখ।'

কাগজটা নিলো দান্তে। উল্টেপাল্টে দেখলো। একটা পাশ পুড়ে গেছে। যেটুকু অক্ষত আছে সেটুকুও ধোঁয়া আর বয়সের ছাপে বাদামী হয়ে গেছে। এক পাশে কিছু কথা লেখা। লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করলো সে। কিন্তু কয়েকবার পড়েও কোন অর্থ উদ্ধার করতে পারলো না।

'কিছু বুঝতে পারছি না,' অবশেষে বললো ও। 'কী এটা?'

'আমার গুপ্তধন,' ফিসফিস করে বললো বৃদ্ধ। 'এতগুলো বছর তোমাকে দেখছি। বুঝতে পেরেছি, সত্যি সত্যিই তুমি আমার বন্ধু। তাই ঠিক করেছি, তোমাকে বলে যাবো এটার কথা।'

শঙ্কিত বোধ করতে লাগলো দান্তে। সত্যিই পাগল নাকি হতভাগ্য লোকটা? গত বছরগুলোতে একবারও মনে হয়নি, কিন্তু আজ হচ্ছে। কী বলবে ও ভেবে

পেলো না। শুধু বললো, 'গুপ্তধন!'

'হ্যাঁ। পাগল ভেবো না আমাকে। যা বলছি সব সত্যি। সত্যিই গুপ্তধন আছে। এবং তার অর্ধেকের মালিক এখন তুমি। মন দিয়ে শোনো, সব বলছি তোমাকে…'

'এখন থাক, ফারিয়া!' হতাশ কণ্ঠে বললো দান্তে। 'তুমি অসুস্থ, দুর্বল। আজকের দিনটা ভালো করে বিশ্রাম নাও। গুপ্তধনের কথা কাল শুনবো।'

'কাল হয়তো দেরি হয়ে যাবে, বাপ। হয়তো বলার জন্যে বেঁচে থাকবো না আমি। না, এডমণ্ড, আজই বলবো। এখনো খুব বেশি বয়েস হয়নি তোমার, ওখানকার সোনা, রত্ন তুমি কাজে লাগাতে পারবে। তুমি আমার ছেলের মতো; সত্যি বলতে কী ছেলের চেয়ে বেশি, তোমাকে ছাড়া কাকে বলবো ওগুলোর কথা?'

পুরোপুরি হতাশ বোধ করছে দান্তে। বৃদ্ধের জন্যে একটু দুঃখও যে হচ্ছে না এমন নয়। সন্দেহ নেই ফারিয়া পাগল। গত বছরগুলোতে কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু সত্যিই ও পাগল। অন্তত এই একটা ব্যাপারে।

দান্তে কী ভাবছে তা যেন বুঝতে পারলো ফারিয়া। 'আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছো না তুমি, তাই না? ভাবছো আমি পাগল। কাগজটা পড়ো! শুধু একবার পড়ো! এর আগে আর কাউকে আমি দেখাইনি ওটা।'

'কাল…কাল এ নিয়ে আলাপ করবো আমরা। আজ তোমার বিশ্রাম দরকার। বেশি কথা বলা উচিত না। কাল…'

'বাপ! আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, কাগজটা পড়ো!'

আবার পড়ার চেষ্টা করলো দান্তে। এবারও কথাগুলোর কোনো অর্থ খুঁজে পেলো না।

'এর অর্ধেক তো পুড়ে গেছে,' বলল ও। 'বাকিটুকুতে যা লেখা আছে তার অর্থ আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'আমি জানি অর্থটা। রাতের পর রাত আমি ওটার পেছনে ব্যয় করেছি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। শেষ পর্যন্ত প্রতিটা বাক্য সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। অর্থটা যখন জানবে, গুপ্তধন কোথায় আছে তাও তোমার জানা হয়ে যাবে।'

'ওই শোনো!' ফিসফিস করে বলেই লাফ দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো দান্তে। পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে কুঠুরির দিকে।

নিজের কুঠুরিতে পৌঁছে স্বস্তি বোধ করছে দান্তে। এই প্রথমবারের মতো বন্ধুর সান্নিধ্য ভীতিকর মনে হচ্ছে। বিন্দুমাত্র সংশয় নেই ওর, গুপ্তধন সম্পর্কে ফারিয়া যা বলেছে তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়, হতে পারে না! ভাবনাটা ভারাক্রান্ত করে তুললো দান্তেকে। ফারিয়া শিক্ষিত, জ্ঞানী। ওর পাণ্ডিত্য মুগ্ধ করেছে ওকে, করেছে বিস্মিত। কিন্তু আজ একী হলো? সেই জ্ঞানী, পণ্ডিত ফারিয়া পাগল!

ভীষণ অসহায় লাগছে দান্তের। ওকে যেদিন শ্যাতো দ্'ইফ-এ আনা হয় সেদিনও সম্ভবত এত অসহায় বোধ করেনি ও। সারা দিনে আর একবারও ফারিয়াকে দেখতে গেল না দান্তে।

সন্ধ্যা হলো। রক্ষী এসে খাবার দিয়ে চলে গেল রোজকার মতো। যেমন ছিলো তেমনি বিছানায় পড়ে রইলো দান্তে। উঠলো না, খেলো না। ফারিয়ার কুঠুরিতে যাওয়ার কথা ভাবতেই কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

অনেকক্ষণ পর দেয়ালের ওপাশে সুড়ঙ্গের ভেতর একটা আওয়াজ শুনতে পেলো দান্তে। ফারিয়া আসছে! একটু পরে গোঙানির মতো একটা শব্দ ভেসে এলো ওর কানে। মুহূর্তে সব ভয় দূর হয়ে গেল দান্তের। অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করলো বৃদ্ধ ফারিয়ার জন্যে। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে সুড়ঙ্গ মুখের পাথরগুলো সরিয়ে ফারিয়াকে ঢুকতে সাহায্য করলো কুঠুরিতে। সাবধানে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো বিছানায়।

'আহ্! আসতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত!' অদ্ভুত এক প্রশান্তির হাসি হেসে ফারিয়া বললো। 'এবার আর কোনও ফাঁকিবাজি চলবে না, এডমণ্ড। আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে!'

'আমার দেশের,' শুরু করলো ফারিয়া, 'সবচেয়ে নামকরা পরিবারগুলোর একটা হচ্ছে স্পাডা পরিবার। এককালে সারা ইতালিতে ওদের চেয়ে ধনশালী আর কেউ ছিলো না। এই স্পাডা পরিবারের সর্বশেষ পুরুষ প্রিন্স স্পাডার বন্ধু ছিলাম আমি। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চিন্তা করতে পারো, মারা যাওয়ার সময় ওর যত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সব দিয়ে গিয়েছিলো আমাকে! অবশ্য স্থাবর সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছু ছিলো না ওর, কারণ শেষ দিকে এসে খুব দরিদ্র হয়ে গিয়েছিলো পরিবারটা। ইতিহাসের যে পর্যায়ে এসে স্পাডারা গরীব হয়ে যায় সেখান থেকেই শুরু আমার কাহিনি।

'সিজার বরগিয়ার আমলে সমস্ত ধন সম্পদ হারায় স্পাডারা। সিজার বরগিয়ার কথা মনে আছে তো? ইতালির ইতিহাস আলোচনার সময় বলেছিলাম ওর কথা। পনর শতকে মধ্য ইতালির ছোট্ট একটা রাজ্য শাসন করতো সে। রাজ্য ছোট হলেও রাজার চাল চলন ছিলো রীতিমতো রাজসিক। আচার আচরণে যেমন বিলাসী তেমনি স্বেচ্ছাচারী। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রাজার রাজ্যেই বাস করতো স্পাডারা। ওদের সম্পদের ওপর চোখ পড়লো বরগিয়ার। সৈন্য সামন্ত নিয়ে রওনা হলো সে স্পাডাদের ধন সম্পদ লুঠ করার জন্যে। কিন্তু স্পাডা পরিবারের তখনকার প্রধান সিজার স্পাডা আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন খবরটা। এক মুহূর্ত দেরি না করে যত ধন-সম্পদ সোনাদানা ছিলো সব লুকিয়ে ফেললেন তিনি। সিজার স্পাডার প্রাসাদ তন্নতন্ন করে খুঁজেও সামান্য কয়েক হাজার ক্রাউন ছাড়া কিছু পেলো না বরগিয়া বা তার সৈনিকরা। সিজার স্পাডাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো বরগিয়ার দুর্গে। অমানুষিক নির্যাতন চালানো হলো। কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রকাশ করলেন না কোথায় লুকিয়েছেন পরিবারের যাবতীয় ধন-সম্পদ। নির্যাতনের ফলে শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন ভদ্রলোক।

'নিঃসন্তান ছিলেন সিজার স্পাডা। তাই বরগিয়া হামলা চালাতে পারে এ খবর পাওয়ার পর পরই একটা নির্দেশনামা লিখে রেখে গিয়েছিলেন তিনি। তাতে লেখা ছিলো, তাঁর মৃত্যুর পর স্পাডা পরিবারের সব ধন-সম্পদের মালিক

হবে তাঁর ভাইপো গিডো স্পাডা। ব্যস এটুকুই। ধন সম্পদগুলো কোথায় লুকানো আছে বা কী করে সেগুলো পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কোনও কথাই ছিলো না তাতে। তবে বিশেষ একটা নির্দেশ ছিলো, পরিবারের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রার্থনা পুস্তকটা যেন যত্ন করে রাখা হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখতে বলেছিলেন ভাইপোকে।

'নির্দেশনামাটা পেয়ে সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজলো ভাইপো। ফল হলো না। স্পাডা পরিবারের মূল্যবান গহনা-গাটি, সোনা-দানা সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত চাচার শেষ নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্ঠার সাথে প্রার্থনা পুস্তকটার হেফাজত করতে লাগলো সে।

'দিন গড়িয়ে চললো। সপ্তাহ, মাস, বছর তারপর শতাব্দী চলে গেল। খুঁজে পাওয়া গেল না ধন-সম্পদ। এদিকে পরিবারের অবস্থা শোচনীয়। দিন আনি দিন খাই অবস্থা। তবে পুরনো প্রার্থনা পুস্তকটা যত্ন করে ধরে রেখেছে সবাই। পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে, তার কাছ থেকে তার পুত্রের কাছে। এভাবে হাত বদল হতে হতে ওটা পৌঁছুলো আমার বন্ধু প্রিন্স স্পাডার কাছে। এবং সব শেষে আমার কাছে।'

থামলো ফারিয়া। এক ঢোক পানি খেলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলো:

'আমার বন্ধু প্রিন্স স্পাডাও ছিলো নিঃসন্তান। মারা যাওয়ার সময় ওর যা কিছু সহায় সম্পদ সব দিয়ে গেল আমাকে, যদিও টাকার অঙ্কে খুব বেশি কিছু না। তার ভেতর ছিলো চমৎকার একটা গ্রন্থাগার—পুরনো পুরনো সব মূল্যবান বই-এ ঠাসা। আর সেই গ্রন্থাগারে ছিলো স্পাডা পরিবারের সেই প্রার্থনা পুস্তকটা। চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা মোটাসোটা বই। কোনাগুলো সোনায় মোড়া। আর কিছু না হোক ঐতিহাসিক জিনিস হিসেবে বইটার দাম প্রচুর।

'১৮১১ সালে, আমি গ্রেফতার হবার মাসখানেক আগে এক বিকেলে ওই গ্রন্থাগারে আমি পড়াশোনা করছিলাম। পড়াশোনা না বলে বলা ভালো স্পাডা পরিবারের প্রাচীন কিছু কাগজপত্র দেখছিলাম। কেন জানি না সেদিন খুব ক্লান্ত লাগছিলো। পড়তে পড়তে কখন যে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেছি টেরও পাইনি।

'যখন ঘুম ভাঙলো, দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘড়িতে ছ'টা বাজার ঘণ্টা পড়ছে। চারদিক অন্ধকার। টেবিলের দেরাজে মোমবাতি ছিলো, তাড়াতাড়ি একটা বের করে নিলাম। এখন এক টুকরো কাগজ হলেই ঘরের কোণের চুল্লী থেকে আগুন ধরাতে পারি মোমবাতিতে। কাগজ পাওয়া এমনিতে কোনও সমস্যা ছিলো না, তবু ওই মুহূর্তে ব্যাপারটা বিরাট এক সমস্যা মনে হলো আমার কাছে। ঘর অন্ধকার, দরকারি কাগজ পুড়িয়ে ফেলছি কিনা টের পাবো কী করে? হঠাৎ মনে পড়লো, সেই প্রার্থনা পুস্তকটার ভেতর এক টুকরো কাগজ আছে। সম্ভবত বইটা যখন স্পাডা পরিবারের কাছে আসে তখন থেকেই আছে ওটা। পৃষ্ঠা-চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। এক কালে হয়তো সাদা ছিলো, এখন বয়সের ভারে হলদে হয়ে গেছে। ওই কাগজটা বের করে নিলাম আগুন

ধরানোর জন্যে।

'কাগজটা চুল্লীর ওপর ধরেছি। এক কোণায় আগুন ধরে গেছে। এমন সময় খেয়াল করলাম, কালো হরফে লেখা ফুটে উঠেছে ওটার ওপর। তাড়াতাড়ি চুল্লীর ওপর থেকে টেনে এনে পায়ের নিচে চেপে নিভিয়ে ফেললাম কাগজটা। কিন্তু ততক্ষণে অর্ধেক পুড়ে গেছে। সকালে যেটা তোমাকে দেখিয়েছি ওটাই সেই কাগজ। এই যে নাও, আরেকবার চেষ্টা করে দেখ, পড়তে পারো কি না!'

ফারিয়ার দীর্ঘ কাহিনি শুনে একটু হলেও মোহিত হয়েছে দান্তে। বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজটা নিলো ও। পড়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না এবারও। তখন ফারিয়া আরেক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলো ওর দিকে।

'আগুনে যে অংশটা পুড়ে গিয়েছিলো সেটা হলো এই,' বললো ফারিয়া। 'টুকরো দুটো পাশাপাশি রেখে আবার পড়ো।'

পড়লো দান্তে। উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠতে চাইলো ওর হৃৎপিণ্ড। এবার পরিষ্কার পড়তে পেরেছে ও। অর্থ বুঝতেও অসুবিধা হয়নি! সত্যিই একটা গুপ্তধন আছে। কাগজে লেখা রয়েছে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ওগুলো!

কাগজে লেখা:

'আমি সিজার স্পাডা, আশঙ্কা করছি, আমার অন্তিম সময় আসন্ন। সিজার বরগিয়া আমাকে হত্যা করে আমার সমস্ত সম্পদ লুঠ করবে। তাই সময় থাকতে আমার যা আছে সব আমি আমার ভাইপো গিডো স্পাডাকে দিয়ে যাচ্ছি। মন্টিক্রিস্টো দ্বীপে যেতে হবে ওকে। ওখানেই আমি আমার ধন-দৌলত লুকিয়ে রেখেছি। পুব দিকের ছোট্ট উপসাগর থেকে বরাবর এগোলে বাইশতম যে পাথরটা তার নিচে আছে ওগুলো। সিঁড়ি বেয়ে নামার পর দেয়াল ভেঙে দ্বিতীয় কামরায় ঢুকতে হবে। সেই কামরার উত্তর-পুব কোণে পাওয়া যাবে আমার ধনদৌলত।

'সিজার স্পাডা।

'মে ২৫, ১৪৯৮।'

'ওহ্, ফারিয়া, বন্ধু!' চিৎকার করে উঠলো দান্তে, 'ক্ষমা করো আমাকে! ঠিকই বলেছো তুমি। গুপ্তধন আছে! এই কাগজ তার প্রমাণ! আমাকে ক্ষমা করে দাও!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাজে কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না, এডমণ্ড। নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই? কাগজটার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে মাসখানেক লাগলো,' আগের কথার সূত্র ধরে বলে যেতে লাগলো ফারিয়া, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন্টিক্রিস্টোয় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। সবকিছু যোগাড়যন্ত্র করে ফেললাম। কিন্তু আমার শত্রুরা ঠেকিয়ে দিলো। জাহাজে উঠছি, এই সময় আমাকে গ্রেপ্তার করলো ওরা। তারপর নিয়ে এলো এখানে।'

থামলো ফারিয়া। আবার এক ঢোক পানি খেলো। তারপর বললো, 'সব বললাম তোমাকে। দুনিয়াতে আমার পরে তুমিই একমাত্র লোক যে মন্টিক্রিস্টোর গুপ্তধনের কথা জানলো। শোনো, আমরা দু'জনই যদি এখান থেকে বেরোতে পারি, ওই সম্পদের অর্ধেক পাবে তুমি। আর যদি তার আগেই

আমি মারা যাই, সব কিছু তৈরি আছে, তুমি পালিয়ে যাবে। পুরো সম্পদই তোমার।'

'কিন্তু স্পাডা পরিবারের কী হবে?' জিজ্ঞেস করলো এডমণ্ড। 'ওদের সম্পত্তি আমরা ভোগ করবো?'

'স্পাডা পরিবারের কেউ আর বেঁচে নেই। আমার বন্ধু প্রিন্স স্পাডাই ছিলো এ বংশের শেষ সন্তান; ওর সব সম্পত্তি ও আমাকে লিখে দিয়ে গিয়েছিলো।'

স্বপ্ন দেখছে যেন দান্তে। ফারিয়ার প্রতিটা কথা ও বিশ্বাস করেছে। তবু কেন যেন মনে হচ্ছে এ সত্যি নয়!

'বন্ধু,' বললো ও, 'স্পাডা পরিবারের সব সম্পত্তির মালিক তুমি। সেই অর্থে মণ্টিক্রিস্টোর গুপ্তধনও তোমার। তোমার মৃত্যুর পর আইন অনুযায়ী তোমার পরিবারই ওগুলোর মালিক হবে।'

'আমার কোনও পরিবার নেই,' বললো ফারিয়া। 'তবে এক ছেলে আছে—সে তুমি! ঈশ্বর পুত্র হিসেবে তোমাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে আমার শেষ দিনগুলোকে সুখে ভরিয়ে দেয়ার জন্যে। আমার মৃত্যুর পর আমার সবকিছু তোমারই হবে, বাপ।'

চোদ্দ

পরের দিনগুলোয় একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলো ফারিয়া। তবে ডান হাত এবং পা-টা এখনো নাড়তে পারছে না। কোনও দিনই আর পারবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে দান্তের। এ নিয়ে অবশ্য কোনও দুশ্চিন্তা নেই ফারিয়ার। আগের মতোই ফুর্তিতে আছে সে। মাঝে মাঝে গুপ্তধনের প্রসঙ্গে আলাপ করে। ওর মৃত্যুর পর দান্তে ওগুলো পাবে ভেবে ও খুব খুশি। সত্যিই ও ছেলের মতো ভালোবাসে, স্নেহ করে দান্তেকে। কাগজে লেখা কথাগুলো দান্তেকে দিয়ে মুখস্থ করিয়েছে ও। তারপর পুড়িয়ে ফেলেছে কাগজটা। গুপ্তধনের মূল্য কত হতে পারে সে সম্পর্কে বলেছে—পনর শতকে কত, এখন কত। শুনে চোখ কপালে উঠে গেছে দান্তের।

'এত টাকা! তুমি কল্পনাও করতে পারো না,' বলেছে বৃদ্ধ। 'তোমার পরিবারে লোকদের সাহায্য করতে পারবে; দরিদ্র, অভাবীদের সাহায্য করতে পারবে। ইচ্ছে হলে জনসেবামূলক অনেক কাজ করতে পারবে।'

স্বপ্নের ঘোরে দিন কাটছে যেন দান্তের। প্রতিদিন নানান রকম পরিকল্পনা করছে ফারিয়ার সঙ্গে বসে। পালানোর পর কোথায় যাবে, সেখান থেকে কী করে যাবে মণ্টিক্রিস্টো দ্বীপে ইত্যাদি ইত্যাদি। ফারিয়া মিটিমিটি হাসে আর শোনে। দান্তে জানে এলবা এবং কর্সিকার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত মণ্টিক্রিস্টো। এ দ্বীপের পাশ দিয়ে অনেকবার আসা যাওয়া করেছে জাহাজ নিয়ে। একদিন মানচিত্র এঁকে দ্বীপটার অবস্থান দেখালো ও ফারিয়াকে। পুব

দিকের ছোট্ট উপসাগরটাও ওকে দেখালো। ওই উপসাগরের কোনখান দিয়ে উপকূলে পৌঁছানো সহজ হবে তা বললো। গুপ্তধন কী করে উদ্ধার করবে, কোথায় বিক্রি করবে, টাকা দিয়ে কী করবে সে নিয়েও আলাপ হলো। মোট কথা বাচ্চা ছেলের মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছে ও। পরের অমাবস্যার রাতেই পালাতে চাইছে। কিন্তু ফারিয়ার হাত পা এখনো অবশ।

'সেটা কোনও সমস্যা নয়,' বলেছে দান্তে। 'এক হাত আর এক পায়ে যতটুকু পারো সাঁতার কেটো, বাকিটা আমি সামলাবো।'

এর মাঝে এক রাতে দান্তে একা গিয়ে সুড়ঙ্গের মুখটা খুঁড়ে রেখে এসেছে। খুব ছোট্ট একটা গর্ত করেছে, কারণ বড় করলে প্রহরীর চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। সব কিছু ঠিকঠাক। গর্তের মুখটা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বেরোনোর উপযোগী করতে কয়েক মিনিট মাত্র লাগবে। সুতরাং চিন্তা নেই। প্রতিদিন একবার করে দেখে আসে দান্তে, গর্তটা ঠিক আছে কিনা।

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো একদিন। ওদের পালানোর আশা নির্মূল হয়ে গেল। বাইরের পথটা মেরামতের জন্যে একদল লোক পাঠানো হলো। দান্তের কুঠুরির ঠিক বাইরেই পথটা। শ্রমিকদের চিৎকার হৈ-হল্লা শুনে বুঝতে পারলো দান্তে, কী করছে তারা। ঘাবড়ে গেল ও। সুড়ঙ্গের মুখটা দেখে ফেলবে না তো?

রাতের বেলায় সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে গেল ও। যা দেখলো তাতে হিম হয়ে আসতে চাইলো হাত পা। বন্ধ সুড়ঙ্গের মুখ! তারমানে দেখে ফেলেছে ওরা! সুড়ঙ্গের ব্যাপারটা কি টের পেয়ে গেছে? না নিছক একটা গর্ত মনে করে মাটি চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে?—ভেবে ভেবে কোনও কূল কিনারা পেলো না দান্তে।

'ঠিক আছে, সুড়ঙ্গের কথা জানতে পেরেছে কিনা আজই বোঝা যাবে,' ভাবলো ও। 'জেনে থাকলে গভর্নর নিজে আসবে আমাদের কুঠুরিগুলো পরীক্ষা করতে।'

বিষণ্ণ মনে ফিরে এলো দান্তে ফারিয়ার কাছে। সব শুনে ফারিয়াও স্তম্ভিত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলো না দু'জনের কেউ।

'প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার সাথে থাকবো,' অবশেষে দান্তে বললো, 'কিছুতেই আমি আর সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে পারবো না। মনে প্রাণে ইচ্ছে করলেও না। তোমার গুপ্তধনও আমি কোনওদিন দেখতে পাবো না। কিন্তু,' বলে চললো ও, 'তাতে কিছু আসে যায় না। আসল গুপ্তধন তো খুঁজে পেয়েছি এই কারাগারে, তোমার ভেতরে। তুমি আমাকে যে জ্ঞান আর শিক্ষা দিচ্ছো তা-ই আমার আসল সম্পদ। তোমার সাথে কথা বলতেও কী আনন্দ!'

আবার সেই পুরনো নিয়মে ফিরে এলো দু'বন্ধু। লেখাপড়া আর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা। ইতোমধ্যে দান্তেও মোটামুটি পণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ইতিহাস আর ইংরেজি ওর প্রিয় বিষয়। দিন নেই রাত নেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা আলাপ আলোচনা করে এসব বিষয়ে। লেখা পড়া যখন একঘেয়ে হয়ে ওঠে তখন কিছু না কিছু হাতের কাজ করে, প্রয়োজনীয় কোনও জিনিস বানায়। মোট

কথা শরীর আর মনকে কখনো অলস থাকতে দেয় না।

দিন চলে যাচ্ছে এভাবে। তারপর এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল দান্তের। ফারিয়া ডাকছে। খুব দুর্বল ওর কণ্ঠস্বর কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে দান্তে। তাড়াতাড়ি ও ফারিয়ার কুঠুরিতে গেল।

মিটমিট করে জ্বলছে ফারিয়ার প্রদীপটা। অস্পষ্ট আলোয় দান্তে দেখলো, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ, মরা মানুষের মতো ফ্যাকাসে মুখ।

'পুত্র!' আরো দুর্বল হয়েছে ফারিয়ার কণ্ঠস্বর। 'আমার সেই অসুখ! আবার! আমার ভয় হচ্ছে, এবারই বোধহয় শেষ।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো দরজার দিকে ছুটে গেল দান্তে।

'কে আছো! কে আছো! শোনো!' চিৎকার করলো ও।

ছটফট করে উঠলো ফারিয়া। দেহের সমস্ত শক্তি এক করে বললো, 'থামো, এডমণ্ড, থামো! সব পণ্ড হবে! আমাদের সুড়ঙ্গটা নষ্ট করে দেবে ওরা!'

এতক্ষণে হুঁশ ফিরলো দান্তের। চিৎকার থামিয়ে ফারিয়ার দিকে তাকালো।

'আমার মৃত্যুর পর,' বলে চললো বৃদ্ধ, 'নিশ্চয়ই ওরা অন্য কাউকে এনে রাখবে এখানে। দু'এক দিনের ভেতর না হলেও একদিন না একদিন আনবেই। তার স্বস্তি এবং আনন্দ হয়ে উঠবে তুমি, ও হবে তোমার। হয়তো··· হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সে আমার মতো বুড়ো অথর্ব হবে না। ওর সঙ্গে পালাতে পারবে তুমি। ঈশ্বর তোমার সহায়, দান্তে। যা তিনি নিয়ে নিয়েছেন তোমার কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি দেবেন। বয়স তো কম হলো না, আর কতদিন আমি বেঁচে থাকবো···'

'না, বন্ধু, না, ও কথা বোলো না!' করুণ কণ্ঠে দান্তে বললো। 'তুমি মরবে না।' বলে এক ছুটে ওষুধের শিশিটা নিয়ে এলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আগেরবার যেমন দিয়েছিলাম এবারও কি তেমনি দেব?'

'এবার বারো ফোঁটা,' বললো ফারিয়া। 'তাতে যদি ভালো না হই, সবটুকু দিয়ে দিও।'

সাবধানে দান্তে বিছানায় শোয়ালো ফারিয়াকে।

'সত্যিই বলছি, বাপ,' বৃদ্ধ বললো, 'আর সময় নেই। মৃত্যুর জন্যে তৈরি আমি। আমার একটাই মাত্র দুঃখ, তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। জীবনে শেষ কটা বছরে তোমার কাছ থেকে যে স্বস্তি, যে আনন্দ আমি পেয়েছি তার বিনিময়ে অনেক অনেক বেশি আনন্দ ঈশ্বর তোমাকে দেবেন!'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো এডমণ্ড। মৃত্যু-পথযাত্রী মানুষটা কাঁপা কাঁপা হাতে স্পর্শ করলো ওর মাথা। তারপর বললো, 'আমি তোমাকে দোয়া করছি, পুত্র।'

কিছুক্ষণ নিস্পন্দ পড়ে রইলো ফারিয়া। তারপর আবার বললো, 'আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, মণ্টিক্রিস্টোতে যাবে তুমি, স্পাডাদের গুপ্তধন উদ্ধার করবে! ওগুলো তোমার। বিনা অপরাধে দীর্ঘদিন যে শাস্তি ভোগ করলে তার ক্ষতিপূরণ। দান্তের একটা হাত টেনে নিলো বৃদ্ধ। 'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!' এক মুহূর্ত থামলো সে। 'আমি যদি—'

'না! না!' ধরা গলায় চিৎকার করলো দান্তে। 'আমাকে ফেলে যেও না!'

তারপর আবার দরজার কাছে ছুটে গিয়ে চেঁচাতে লাগলো, 'কে আছো! কে আছো! শুনে যাও দয়া করে!'

'চুপ! আমি বলছি চুপ করো! নইলে সব যাবে,' দেহের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে বললো ফারিয়া। চোখ দুটো বোজা। আচমকা শোয়া থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!' চিৎ হয়ে বিছানায় পড়ে গেল ফারিয়া।

বসে আছে দান্তে। দেখছে। মরার মতো পড়ে আছে ফারিয়া। এখনো মারা যায়নি। ওষুধ দেয়ার কী এটাই ঠিক সময়? বুঝতে পারছে না দান্তে। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো ও। তারপর ফারিয়ার মুখটা হাঁ করিয়ে ঢেলে দিলো বারো ফোঁটা ওষুধ। অপেক্ষা করলো কয়েক মিনিট। কিন্তু কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। যেমন ছিলো তেমনি পড়ে আছে ফারিয়ার দেহ। শীতল, স্থির। আবার মৃত্যু পথযাত্রী লোকটার মুখ হাঁ করলো দান্তে। শিশির বাকি ওষুধটুকু ঢেলে দিলো তার গলায়।

কিছুক্ষণ পর চোখ মেললো ফারিয়া। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো দান্তের মুখ। কিছু বলতে গেল। তার আগেই অস্ফুট আর্তনাদের মতো একটা শব্দ বেরোলো ফারিয়ার গলা দিয়ে। কেঁপে উঠলো দেহটা। তারপর পড়ে রইলো স্থির।

বৃদ্ধের বুকের বাঁ পাশে হাত রেখে দান্তে অনুভব করলো, স্তব্ধ হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। মারা গেছে ফারিয়া।

ভগ্নহৃদয়ে বসে রইলো দান্তে ফারিয়ার কুঠুরিতে। নিঃশব্দে কাঁদলো কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলো। তারপর এক সময় ভোরের ঝাপসা আলো এসে পড়লো জানালা দিয়ে। প্রদীপটা তখনো জ্বলছে মিটমিট করে। তাড়াতাড়ি ওটা নিভিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকলো দান্তে। পাথর সাজিয়ে বন্ধ করলো সুড়ঙ্গের মুখ। ফিরে এলো নিজের কুঠুরিতে।

একটু পরেই খাবার দিয়ে গেল কারারক্ষী। তারপর এগিয়ে গেল ফারিয়ার কুঠুরির দিকে। এক মুহূর্ত দেরি না করে আবার সুড়ঙ্গে ঢুকলো দান্তে। দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল ফারিয়ার কুঠুরির কাছে। আলগা পাথরের ফাঁকে কান লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল একটু পরেই। পায়ের আওয়াজ।—রক্ষী ঢুকেছে কুঠুরিতে। পাথরের টেবিলের ওপর খাবারের থালা রাখার শব্দ হলো। তারপরই আতঙ্কিত চিৎকার রক্ষীর: 'কে আছো! জলদি এসো! দেখে যাও!' ধুপধাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল সে কুঠুরি ছেড়ে।

অপেক্ষা করতে লাগলো দান্তে। একটু পরে আবার পদশব্দ। এবার অনেক মানুষের। গভর্নরের কণ্ঠ শোনা গেল: 'হ্যাঁ, মারাই গেছে মনে হচ্ছে!'

তারপর আবার নীরবতা। পায়ের শব্দ চলে গেল দরজার দিকে। গভর্নর বোধহয় বেরিয়ে গেল।

'বেশ বেশ, বুড়ো তাহলে গেছে শেষ পর্যন্ত।' রক্ষীর গলা শোনা গেল। 'যাত্রা শুভ হোক!'

'আমাদের ফেলে গুপ্তধন খুঁজতে গেল বোধহয়,' অন্য একজন বললো।

হো-হো করে হেসে উঠলো বাকিরা।

'বেচারা! এত ধন সম্পদের মালিক, মরার সময় কিনা কাফনের কাপড় কেনার মতো পয়সাটাও রেখে যেতে পারলো না!'

আবার হাসির হররা উঠলো।

'তাতে কী, তাতে কী, আমাদের শ্যাতো দ্'ইফ-এর গোরস্তানে দাফন করতে খুব একটা খরচ লাগে না,' হাসতে হাসতেই বললো একজন।

রক্ষী ও তার সঙ্গীদের চলে যাওয়ার শব্দ শুনলো দান্তে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো আবার। সঙ্গে গভর্নর আর নতুন এক লোক।

'হ্যাঁ, মারা গেছে,' নতুন লোকটা বললো।

'মৃত্যুর কারণ?' গভর্নরের প্রশ্ন।

'ক্যাটালেপসি।'

'তুমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছো ও মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন গভর্নর। 'কারাগারের নিয়মকানুন নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার, ডাক্তার? তোমাকে প্রমাণ করতে হবে ও মারা গেছে।' দরজার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'এই, এক টুকরো গনগনে কয়লা নিয়ে এসো তো কেউ!'

দরজা খোলার শব্দ শুনলো দান্তে। কেউ বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এলো আবার। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। পোড়া মাংসের গন্ধ ঢুকলো দান্তের নাকে। গভর্নর আর তার সঙ্গীরা কী করছে মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। কেমন একটা গা গুলানো অনুভূতি হলো ওর।

'দেখেছেন!' ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'এখনো সন্দেহ আছে আপনার?'

কোনও জবাব শুনতে পেলো না দান্তে।

'কখনো জ্বালায়নি তোমাকে, তাই না?' রক্ষীকে জিজ্ঞেস করলেন গভর্নর।

'না, স্যার। বরং মজার মজার গল্প শুনিয়েছে অনেকবার। আমার স্ত্রীর যখন অসুখ হলো সেবার, কী ওষুধ দিতে হবে ও বলে দিয়েছিলো।'

'আচ্ছা!' বিস্মিত কণ্ঠে বললো ডাক্তার। 'ও তাহলে ডাক্তার ছিলো! সেক্ষেত্রে, স্যার, আমার মনে হয় শেষকৃত্যটা একটু ভালোভাবে করা উচিত।'

'নতুন একটা বস্তার ব্যবস্থা করা হবে ওর জন্যে। চলবে?' হাসতে হাসতে জবাব দিলেন গভর্নর।

'এখনি আমরা সেরে ফেলবো কাজটা, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো রক্ষী।

'নিশ্চয়ই। আমি এখানে থাকতে থাকতেই। জলদি, হাত চালিয়ে!'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ পায়ের আওয়াজ শুনলো দান্তে। আসছে যাচ্ছে। কিছু একটা টেনে আনা হলো মেঝের ওপর দিয়ে। বিছানার ওপর রাখা হলো কিছু।

'ওকে নিতে কখন আসবে ওরা, স্যার?'

'দশটা থেকে এগারোটার ভেতর।'

'ততক্ষণ কি আমরা এখানে থাকবো?'

'না। কী দরকার? দরজায় তালা দিয়ে রাখো, তাতেই হবে।'

সম্মিলিত পায়ের শব্দ চলে গেল কুঠুরির বাইরে। লোহার দরজা বন্ধ হলো ঘটাং করে। তালার ভেতর চাবি ঢোকানোর শব্দ। তারপর সব নিস্তব্ধ।

আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো দান্তে। তারপর গুড়ি মেরে ঢুকে পড়লো ফারিয়ার কুঠুরিতে।

পনেরো

হলদেটে একটা বস্তা পড়ে আছে বিছানার ওপর। ভেতরে ফারিয়ার দেহ। ওটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো দান্তে। কী করবে কিছু বুঝতে পারছে না। দুঃখে ফেটে যেতে চাইছে ওর অন্তর। নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। বন্ধুকে হারিয়েছে ও! সহানুভূতিপূর্ণ সেই চোখ দুটো আর কখনো তাকাবে না ওর দিকে! দয়ালু কণ্ঠে আর কেউ কথা বলবে না ওর সাথে! সেই কর্মঠ হাত দুটো আর স্পর্শ করবে না ওকে! কক্ষনো না!

এখন ও একা। বন্ধুবিহীন একা। ফারিয়া তো শুধু বন্ধু ছিলো না, এই নিঃসঙ্গ কারা প্রকোষ্ঠে পিতার স্নেহ দিয়েছে ওকে। এখন কী করে তাকে ছাড়া থাকবে ও? চরম হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে দান্তে ভাবলো, 'আমি আত্মহত্যা করবো। মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আমি ওর সাথে থাকবো। কিন্তু কী করে আমি হত্যা করবো নিজেকে?··· হ্যাঁ, রক্ষী যখন আসবে সন্ধ্যার খাবার নিয়ে ওকেই আমি খুন করবো। তাহলে ওরা আমাকে ফাঁসি দেবে··· আহ্ কেন বেঁচে থাকবো আমি?'

এমনি সব অশুভ চিন্তার স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল দান্তেকে। তারপর, এক সময়, ও কিছু টের পাওয়ার আগেই থিতিয়ে এলো ভাবনাগুলো। হঠাৎ করেই বেঁচে থাকার ভয়ানক এক আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলো মনের ভেতর। 'না! মরলে চলবে না,' আপন মনে বললো ও। 'ফারিয়ার আত্মা শান্তি পাবে না তাতে। মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করতে হবে আমাকে। তুমি তো তাই চেয়েছিলে, বন্ধু!' বস্তার ওপর দিয়ে ফারিয়ার দেহটা আঁকড়ে ধরলো দান্তে। 'ওহ্! ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য করো, শক্তি দাও! শক্তি দাও, বন্ধু! আমাকে সাহায্য করো!'

বিদ্যুৎচমকের মতো বুদ্ধিটা খেলে গেল ওর মাথায়। কুঠুরির কোনায় সেই আলগা পাথরটার নিচ থেকে নিয়ে এলো ফারিয়ার ছুরিটা। ঝটপট কেটে ফেললো বস্তার মুখের সেলাই। ফারিয়ার দেহটা বের করে সাবধানে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল নিজের কুঠুরিতে। তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলো নিজের বিছানায়। শরীরটা এমনভাবে কাত করে রাখলো যেন মুখটা দেয়ালের দিকে ফিরে থাকে। বিছানার তেল চিটচিটে চাদরটা দিয়ে ঢেকে দিলো ও ফারিয়াকে। মাথা ঝুঁকিয়ে আলতো করে চুমু খেলো শীতল কপালটায়। তারপর চাদর টেনে দিলো ফারিয়ার মাথার ওপর। কুঠুরির চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকলো দান্তে। আলগা পাথরগুলো সাজিয়ে দিলো সুড়ঙ্গ-মুখে।

ফারিয়ার কুঠুরিতে ফিরে এলো ও। প্রথমেই আলগা পাথরগুলো যত্ন করে সাজালো সুড়ঙ্গের মুখে। একটু বেশি যত্ন নিলো আজ পাথরগুলো সাজাতে। তারপর লুকানো জায়গা থেকে সুঁই সুতো বের করলো। শরীরের ছেঁড়া কাপড়গুলো খুলে ফেলে ঢুকে পড়লো বস্তার ভেতর। ছুরিটা কোমরে গুঁজে নিতে ভুললো না।

বস্তার ভেতর শুয়ে সাবধানে ওটার মুখ সেলাই করলো দান্তে। যথাসাধ্য চেষ্টা করলো মূল সেলাই যেমন ছিলো তেমন করার। তারপর ফারিয়া যে ভঙ্গিতে পড়ে ছিলো ঠিক সেই ভঙ্গিতে পড়ে রইলো ও। কোমর থেকে ছুরিটা খুলে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলো।

প্রায় এক নিশ্বাসে অনেকগুলো কাজ করেছে ও। ফলে এমন হাঁপাচ্ছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও বুকের ওঠানামা থামাতে পারছে না। এখন যদি সৈনিকরা আসে ফারিয়াকে নিয়ে যেতে, নিঃসন্দেহে টের পেয়ে যাবে, বস্তার ভেতর মানুষটা মৃত নয় জীবিত।

ভাগ্য ভালো দান্তের, তক্ষুণি এলো না সৈনিকরা। যখন এলো ততক্ষণে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে ও, যদিও কেবলই মনে হচ্ছে বুকের ধুকপুকানির শব্দ শুনে ফেলবে ওঁরা। নিস্তব্ধ কুঠুরিতে ওই শব্দটুকুই অনেক জোর মনে হচ্ছে ওর।

ছুরির বাঁটটা শক্ত করে ধরে রেখেছে দান্তে। ওটাকেই এখন একমাত্র অবলম্বন মনে হচ্ছে। যদি বিপদে পড়ে ছুরিটাই ওকে বাঁচাবে, অন্য কিছু নয়। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবার চেষ্টা করছে ও, কী করে পালাবে, কী করে বেরোবে এই বস্তার ভেতর থেকে! গোরস্তানে কবর দেয়ার আগে যখন মাটিতে নামিয়ে রাখবে তখন হয়তো একটা সুযোগ পাওয়া যাবে, ভাবলো দান্তে। তা যদি না পাওয়া যায়, কবর দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও, তারপর ছুরি দিয়ে মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু পারবে তো? বেরিয়ে আসার আগেই যদি দম শেষ হয়ে যায়? ও নাবিক মানুষ, দম আটকে অনেকক্ষণ পানির নিচে থাকতে পারে।—না, পারতো। এখনো কী পারে? চোদ্দ বছরের বেশি পার হয়ে গেছে তারপর, এখনো কি আছে ওর সেই ক্ষমতা? দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলতে লাগলো মন। অবশেষে সব দুশ্চিন্তা কাটিয়ে উঠলো ও। যদি না পারে তাহলে কী হবে? মরবে? তাতেই বা কী ক্ষতি? আবার সেই কুঠুরিতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো! তবে হ্যাঁ, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ও, যেন পালানো যায়।

প্রথম বিপদটা আসবে সাতটার সময়, ভাবলো ও। ওই সময় রক্ষী রাতের খাবার নিয়ে আসে। কী দেখবে সে? দেখবে দান্তে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। প্রায়ই দান্তে অমন শুয়ে থাকে। আজও কি সে কিছু না বলে খাবার রেখে চলে যাবে, না ওকে জাগিয়ে সেই গুপ্তধনওয়ালা পাগল বন্দীর মৃত্যু সংবাদ জানাবে? প্রথমে হয়তো ডাকবে ওকে। তারপর সাড়া না পেয়ে খবরটা জানাবে। তারপরও যদি জবাব না পায় তখন কি কাছে গিয়ে ওকে জাগানোর চেষ্টা করবে না? এখানে এসেই চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল দান্তের।

দুর্গ-চূড়ার ঘড়িতে ঢং করে সাতটা বাজলো। ধড়াস করে লাফিয়ে উঠলো

ওর হৃৎপিণ্ড। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করলো ভুরুতে, কপালে। দান্তের মৃত্যু-প্রহর কি ঘোষিত হলো?

অখণ্ড নিস্তব্ধতা চারপাশে। মুহূর্তের জন্যেও বিঘ্নিত হয়নি এই নিস্তব্ধতা। সাতটার ঘণ্টা যখন পড়ে তখন যেমন ছিলো এখনো তেমনি আছে। এর ভেতর আটটার ঘণ্টা পড়েছে। ন'টার ঘণ্টা পড়েছে সে-ও অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে দান্তের। একটা বিপদ কেটেছে! সন্ধ্যার খাবার দিতে গিয়ে কিছুই টের পায়নি রক্ষী!

ঢং ঢং করে দশটা বাজার সংকেত ঘোষণা করলো কারাগারের ঘড়ি। তার কয়েক মিনিটের মাথায় পায়ের আওয়াজ পেলো দান্তে। প্রথমে তালা পরে দরজা খোলার শব্দ। দু'জন লোক ঢুকলো। বস্তার ভেতর থেকে দান্তে দেখলো, দুটো অস্পষ্ট ছায়া এগিয়ে আসছে। একজন ধরলো বস্তার এক মাথা, অন্যজন অন্য মাথা। দান্তে অনুভব করলো, তুলে ফেলা হলো ওকে। পরমুহূর্তে আবার নামিয়ে রাখলো।

'উহ্! বুড়ো মানুষের এত ওজন হয়!' বললো একজন।

'কেমন রোগা ছিলো ব্যাটা!' আরেকটা কণ্ঠস্বর।

'কথায় বলে বয়েস যত বাড়ে হাড়ের ওজনও নাকি ততো বাড়ে।'

'হতে পারে।'

আবার তুলে নিলো ওকে লোক দু'জন। নিয়ে চললো কুঠুরির বাইরে। মরা মানুষের মতো নিস্তব্ধ পড়ে রইলো দান্তে। একটু পরেই রাতের শীতল বাতাসের স্পর্শ পেলো ওর শরীর। উঁচু নিচু পথ ভেঙে বিশ পঁচিশ গজ মতো গেল ওরা, তারপর বস্তাটা নামিয়ে রাখলো মাটিতে। পায়ের শব্দ শুনে দান্তের মনে হলো, একজন দূরে চলে যাচ্ছে। অন্যজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো; উহ্! একেবারে মেরে ফেলেছে! ভাবতেই পারিনি ওই হাড় জিরজিরে শরীরটার এত ওজন!'

'এখনই কি সুযোগ?' মনে মনে প্রশ্ন করলো দান্তে। 'এখনই কি চেষ্টা করবো পালানোর?'

'না,' মনের গভীর থেকে জবাব দিলো কেউ, 'এখন নয়, এখনও সময় হয়নি আরেকটু ধৈর্য ধরো।'

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো দান্তে। যে লোকটা দূরে চলে গিয়েছিলো একটু পরেই সে ফিরে এলো।

'নাহ্, দরকার মতো বড় পাচ্ছি না,' বললো লোকটা। 'তোমার লণ্ঠনটা দাও দেখি, ভালো করে খুঁজে দেখি আরেকবার।'

লণ্ঠন নিয়ে চলে গেল সে।

'কী খুঁজছে ও?' অবাক হয়ে ভাবলো দান্তে।

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' ফিরে এসেছে লোকটা। বেশ ভারি কিছু একটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে লাগলো সে।

'পাথর নাকি?' মনে মনে প্রশ্ন করলো দান্তে।

ভারি জিনিসটা বস্তার ভেতরের দেহটার পায়ের সাথে বেঁধে দিলো লোক

দুটো।

'ভেসে উঠবে না তো?'

'পাগল!'

'ঠিক জানো?'

'একদম ঠিক।'

আবার তোলা হলো দান্তেকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল লোক দুজন। একটা দরজা খুললো। সাগরের গর্জন শুনতে পেলো দান্তে। উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাথরের ওপর। কারাগারের বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে?

'বেচারার শেষ যাত্রার পক্ষে একটু বেশি খারাপ আবহাওয়াটা,' একজন বললো।

'কিছু এসে যায় না। ও টেরই পাবে না।'

'ব্যস। এসে গেছি। এখান থেকেই।'

'না, আরেকটু এগোও। আগেরজন পাথরের ওপর পড়ে ছাতু হয়ে গিয়েছিলো। গভর্নর কেমন রেগে গিয়েছিলো মনে আছে?'

আরো কয়েক পা বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো দান্তেকে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার—এক, দুই, তিন!'

দান্তে অনুভব করলো, বাতাসে ছুঁড়ে দেয়া হলো ওকে। তারপর শুরু হলো পতন। ভারি জিনিসটা টানছে ওকে নিচে। আরো নিচে··· আরো নিচে! তারপর ঝপাং করে একটা শব্দ। সাগরে পড়লো বস্তা। মুহূর্তে ভিজে গেল দান্তের শরীর। এখনও ওজনটা ওকে নিচে টানছে।

শ্যাতো দ্'ইফ-এর গোরস্তান তাহলে সাগর!

ষোলো

ফারিয়ার ছুরিটা এখনো দান্তের হাতে। ঝটপট ও বস্তার মুখ কেটে ফেললো। মাথা, ঘাড়, বুক বের করে আনলো বস্তার বাইরে। হাত দুটোও। কিন্তু সেই ভারি পাথরটা এখনো বাঁধা রয়েছে ওর পায়ের সাথে। ক্রমশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে সাগরের গভীরে। দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে শরীরটাকে সামনে ঝুঁকালো ও। দ্রুত হাতে ছুরি চালিয়ে কেটে ফেললো পাথর বাঁধা রশিটা। ওপরে উঠতে শুরু করলো দান্তে। শূন্য বস্তা নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে পাথর।

রাতের নির্মল শীতল হাওয়ায় শ্বাস নিলো দান্তে। তারপর আবার ডুব দিয়ে সাঁতরাতে শুরু করলো। শ্যাতো থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। কিছুক্ষণ পর দম নেয়ার জন্যে পানির উপরে মাথা তুললো ও। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো চারপাশে। সামনে, ডানে, বাঁয়ে পড়ে আছে বিশাল বিস্তৃত সাগর; রাতের মতো কালো। কালো মেঘ আকাশের বেশিরভাগ অংশ ছেয়ে ফেলেছে। পেছনে দূরে দেখা যাচ্ছে কালো পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আরো কালো শ্যাতো দ্'ইফ।

এর মধ্যেই বেশ খানিকটা সরে আসতে পেরেছে দান্তে।

পাহাড়ের ওপর মিটমিটে একটা আলোর ওপর পড়লো ওর দৃষ্টি। ওকে যারা বয়ে এনেছিলো তাদের লণ্ঠন ওটা? তার মানে এখনো ওরা রয়েছে? দেখে ফেলেনি তো ওর ভেসে ওঠা?

তাড়াতাড়ি আবার ডুব দিলো দান্তে। যতক্ষণ দম রইলো ততক্ষণ ডুব সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চললো। তারপর আবার ভেসে উঠলো। পেছন ফিরে তাকালো। আরো দূরে চলে গেছে শ্যাতো দ'ইফ। লণ্ঠনটা নেই!

সাগরের কালো জল কেটে এগিয়ে চললো দান্তে। টিবুলেঁ দ্বীপের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। মার্সেই উপকূলের জনবসতিহীন দ্বীপগুলোর ভেতর ওটাই এখান থেকে সবচেয়ে কাছে।

শ্যাতো দ'ইফ থেকে তিন মাইলের কম নয় টিবুলেঁর দূরত্ব। সাগরের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। ঝড়ো হাওয়া বইছে।

'ঈশ্বর! শক্তি দাও আমাকে,' প্রার্থনা করছে দান্তে।

দু'ঘণ্টা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের সাথে যুদ্ধ করলো ও। তারপর আর পারলো না। অবশ হয়ে এসেছে হাত, পা। মাথা তুলে রাখতে পারছে না পানির ওপর। সাগরের কালো রূপ আরো কালো হয়েছে যেন। কালো মেঘের দল কি আরো নিচে নেমে এসেছে? সমস্ত শরীর এলিয়ে আসতে চাইছে দান্তের। আর কত দূরে টিবুলেঁ দ্বীপ?

'পারলাম না! আহ, পারলাম না!' মনে মনে বললো দান্তে। 'শ্যাতো দ'ইফ-এর বাইরে এসেও পারলাম না বাঁচতে। বন্ধু, ফারিয়া, ক্ষমা করো আমাকে। আমি পারলাম না!'

ডুবছে দান্তে। এমন সময় হঠাৎ শক্ত কিছু ঠেকলো ওর হাঁটুতে। নেতিয়ে পড়া শরীরটা মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেল দান্তের। পা নামিয়ে দিলো। হ্যাঁ, পৌঁছে গেছে। টিবুলেঁ দ্বীপে পৌঁছে গেছে। পায়ের নিচে মাটি পেয়েছে দান্তে।

বেশ কিছুক্ষণ গলা পানিতে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নিলো ও। বুক ভরে টেনে নিলো বাতাস। তারপর এগোলো কূলের দিকে। উপকূলটা পাহাড়ী। হাঁচড়েপাঁচড়ে বড় একটা পাথরের ওপর উঠে পড়লো দান্তে। হাঁটু গেড়ে বসে কৃতজ্ঞতা জানালো ঈশ্বরকে। তারপর পাথরটার উল্টো দিকের এক খাঁজে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য ঘুমাতে পারলো না দান্তে। বিদ্যুৎচমক আর বজ্রপাত জাগিয়ে দিলো ওকে। ঝড়ো বাতাস এখন তাণ্ডব রূপ নিয়েছে। একটু পরেই ঝমঝমিয়ে নামলো বৃষ্টি। গুড়ি মেরে পাথরের আরো নিচে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলো দান্তে। সাগরের বিশাল ঢেউগুলো ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে ওর চারপাশে। থরথর করে কেঁপে উঠছে পাথর। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা ধরে যাওয়ার অবস্থা।

এমন সময় অস্পষ্ট আর্তচিৎকারের মতো একটা শব্দ শুনতে পেলো দান্তে। মানুষ? মানুষ কোত্থেকে আসবে এমন রাতে এ জায়গায়। নাকি বাতাসের গর্জন? গুড়ি মেরে বেরিয়ে এলো ও। একটু উঁচু হয়ে পাথরের আড়াল থেকে দেখার চেষ্টা

করলো। বিদ্যুৎ চমকালো এই সময়। ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ছোট একটা জেলে নৌকাকে টিবুলেঁর পাহাড়ী উপকূলের দিকে তাড়িয়ে আনছে ঝড়। আবার চমকে উঠলো বিদ্যুৎ। উন্মত্ত ঢেউ অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে দিলো নৌকাটাকে। চারদিক আবার কালো হয়ে যাওয়ার আগেই সেটা আছড়ে পড়লো সাগরের ওপর মাথা বের করে থাকা একটা পাথরের ওপর। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল নৌকাটার পাল, মাস্তুল, কাঠামো। অস্পষ্ট আর্তনাদের শব্দ কয়েকটা। চারদিক আবার অন্ধকার। ঝড় ও সাগরের একটানা গর্জন ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

সারারাত সেই ভয়ঙ্কর ঝড় চললো। ভোরের দিকে শান্ত হয়ে এলো প্রকৃতি। অবাক হয়ে দান্তে দেখলো, সূর্য উঠছে। সাগর এখন শান্ত, ভোরের সূর্যের আলোয় সোনার মতো—নাকি স্পাডাদের রত্নের মতো?—ঝকমক করছে!

অনেক অনেক দূরে শ্যাতো দ্'ইফ-এর কালো অবয়বটা যেন সাগর ফুঁড়ে মাথা তুলেছে। ওটার দিকে চোখ পড়তেই আতঙ্কিত বোধ করতে লাগলো দান্তে। 'একটু পরেই রক্ষী আমার কুঠুরিতে যাবে,' ভাবলো ও। 'ফারিয়াকে দেখবে আমার বিছানায়। তারপর? গভর্নর আসবে, সুড়ঙ্গটা খুঁজে পাবে, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে ওদের কাছে। চারদিকে সৈনিক পাঠাবে। মার্সেইয়ে খুঁজবে। সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজবে। নিঃসন্দেহে এখানেও আসবে। কী করে আমি বাঁচবো ওদের হাত থেকে? শরীরে কাপড় বলতে প্রায় কিছুই নেই, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, ঠাণ্ডা··· ছুরিটাও খুইয়েছি··· ওহ ঈশ্বর! দয়া করো আমাকে। অনেক দুর্ভোগ সয়েছি। আর পারবো না। আমাকে শক্তি দাও, ঈশ্বর।'

ভাবতে ভাবতে উপকূল ধরে হাঁটছে দান্তে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে সাগরের দিকে। হঠাৎ ওর মনে হলো, দিগন্তের কাছাকাছি ছোট্ট বিন্দুর মতো কিছু একটা যেন ও দেখতে পেয়েছে। ভুরু কুঁচকে ভালো করে তাকালো দান্তে। হ্যাঁ, জাহাজই মনে হচ্ছে। মার্সেই-এর দিক থেকে আসছে, যাচ্ছে ইতালির দিকে। ঈশ্বর কি তাহলে ওর প্রার্থনা শুনেছেন? দ্রুত একটা ভাবনা খেলে গেল দান্তের মাথায়, যদি কোনও মতে একবার জাহাজটার কাছে পৌছুতে পারে, ও বলতে পারবে, কাল রাতে বিধ্বস্ত সেই জেলে নৌকার মাঝি ও। তাহলে কি ওরা ওকে জাহাজে তুলে নেবে না?

তক্ষুণি সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লো দান্তে। কাল রাতে যেখানে নৌকাটাকে বিধ্বস্ত হতে দেখেছে সাঁতার কেটে সেদিকে গেল প্রথমে। ডুবো পাহাড়টার ওপরে কয়েক টুকরো তক্তা আর একটা নাবিকদের লাল টুপি ছাড়া আর কিছু ওর চোখে পড়লো না। টুপিটা মাথায় পরে নিলো দান্তে। তারপর একটা তক্তা নিয়ে আবার নামলো সমুদ্রে। তক্তা ধরে এগিয়ে চললো জাহাজটার দিকে।

ঢেউ সাহায্য করছে ওকে। ফলে বেশিক্ষণ লাগলো না জাহাজটার কাছে পৌছুতে। মাথার লাল টুপিটা হাতে নিয়ে নাড়তে লাগলো দান্তে। সেই সাথে চিৎকার: 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

কয়েক মিনিটের ভেতর জাহাজের নাবিক খালাসীরা ওকে দেখতে পেলো। মুখ ঘুরে গেল জাহাজটার। এখন ওর দিকে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর একটা

নৌকা নামানো হলো। দু'জন খালাসী লাফিয়ে নামলো তাতে। দ্রুত হাতে দাঁড় টেনে এগিয়ে আসতে লাগলো দান্তের কাছে। তক্তা ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে সাঁতরাতে লাগলো দান্তে নৌকার দিকে। এক মিনিট পরেই বুঝতে পারলো ক্ষুধা তৃষ্ণায় কতখানি কাতর ও। আর পারছে না সাঁতার কাটতে। কাল রাতের মতো ভারি হয়ে আসছে হাত-পা। বার কয়েক হাবুডুবু খেলো।

দেহের শেষ শক্তিটুকু এক করে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে দান্তে। এমন সময় শুনতে পেলো, নৌকা থেকে একজন চিৎকার করে উঠেছে: 'নোড়ো না! ভেসে থাকো শুধু! আর একটুক্ষণ! আমরা আসছি!'

আর কিছু শুনতে পেলো না ও। ডুবে গেল। কোনও মতে আবার মাথাটা জাগালো পানির ওপর। আবার ডুবে গেল। তারপর কেউ একজন খামচে ধরলো ওর চুল। টানছে ওপর দিকে। শক্ত দুটো বাহু আঁকড়ে ধরলো কাঁধ। আর কিছু মনে নেই দান্তের।

বেশ কিছুক্ষণ অচেতন অবস্থায় পড়ে রইলো দান্তে জাহাজটার ডেকে। অবশেষে নড়ে উঠলো ওর শরীর। চোখ মেলে তাকালো। কৌতূহলী এক দল লোক ঘিরে ধরেছে ওকে। তাদের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই উঠে বসলো ও। সন্ত্রস্ত দৃষ্টি চোখে। ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো পেছনে। পরম স্বস্তির এক নিশ্বাস ছাড়লো ও। অদৃশ্য হয়ে গেছে শ্যাতো দ্'ইফ! পূর্ণ বেগে জাহাজ ছুটছে ইতালির দিকে।

নাবিকদের দিকে তাকালো আবার দান্তে। একজন এগিয়ে এসে এক পাত্র ব্র্যাণ্ডি ধরলো ওর ঠোঁটে। এক চুমুকে ব্র্যাণ্ডিটুকু শেষ করে ফেললো দান্তে। একটু য়েন সুস্থ বোধ করছে এখন।

'আমি কোথায়?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ও।

'মালবাহী জাহাজ অ্যামেলিয়ার ডেকে,' হাসিখুশি এক নাবিক জবাব দিলো।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'লেগ হর্ন।'

দু'চোখ ভেঙে আনন্দের অশ্রু নামলো দান্তের। সত্যিই তাহলে ফ্রান্সের দিকে যাচ্ছে না এ জাহাজ!

বৃদ্ধ এক নাবিক, সম্ভবত অ্যামেলিয়ার ক্যাপ্টেন, এগিয়ে এলো এবার।

'তুমি কে?' ইতালীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করলো সে।

'একজন নাবিক। কাল রাতের ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে আমার জাহাজ। সিসিলি থেকে গম নিয়ে আসছিলাম। আমার সব সঙ্গী...'

'জানি না, আসলে তুমি কী,' বাধা দিয়ে বললো ক্যাপ্টেন। 'তোমার চুল দাড়ি তো দেখি এক হাত লম্বা!'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল দান্তের, ও একজন পালিয়ে আসা কয়েদী। একটা ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি বললো, 'চুল দাড়ির কথা বলছেন? এর একটা ইতিহাস আছে। ভয়ানক বিপদে পড়ে এক ভদ্রমহিলার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, অন্তত একবার জাহাজডুবির পর যদি উদ্ধার না পাই তাহলে দশ বছরের ভেতর চুল দাড়ি কাটবো না। দশ বছর যদিও হয়নি, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। আজ আমি

উদ্ধার পেয়েছি। কে আমাকে পানি থেকে টেনে তুলেছিলো?'

'আমি,' দীর্ঘদেহী এক হাসিখুশি নাবিক জবাব দিলো।

উঠে তাকে জড়িয়ে ধরলো দান্তে। 'কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো, ভাই?'

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করে রইলো ক্যাপ্টেন। তারপর বললো, 'তোমাকে নিয়ে কী করি এখন ভেবে পাচ্ছি না।'

'আপনার যা ইচ্ছা। আমি আমার ক্যাপ্টেনকে হারিয়েছি, আমার জাহাজ ডুবে গেছে, সঙ্গীদের হারিয়েছি। এখন আপনার যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। জাহাজ চালানোর কায়দাকানুন আমি ভালোই জানি, আপনি চাইলে আমি আপনার জাহাজে কাজ করতে পারি। আর যদি তা না চান, প্রথম যে বন্দরে আপনি জাহাজ ভেড়াবেন সেখানে নামিয়ে দেবেন আমাকে।'

'এ অঞ্চলের সাগর কতখানি চেনো?'

'আমার হাতের তালুর মতোই। এ অঞ্চলের যে কোনও বন্দরে আমি চোখ বুজে জাহাজ নিয়ে যেতে পারবো।'

'সেক্ষেত্রে,' হাসিখুশি নাবিকটি, যার নাম জাকোপো এবার বললো, 'ওর জন্যে কাজ আছে আমাদের জাহাজে, তাই না, ক্যাপ্টেন?'

'ও যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে।' সন্দেহের সুর ক্যাপ্টেনের গলায়।

খুশিতে লাফিয়ে উঠতে চাইলো দান্তের হৃদয়।

'দেখুন তাহলে, আমি কেমন চালাই! আপনারা তো, লেগহর্ন-এ যাবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বার বার এত দিক বদলাচ্ছেন কেন? ওই দ্বীপটার আরো কাছ দিয়ে গেলেই তো টানা বাতাস পেতে পারেন।'

'তা পারি। কিন্তু যদি ডুবো পাথরে জাহাজ ধাক্কা খায়?'

'খাবে না। দেখুন আমি নিয়ে যাচ্ছি,' বলে হালের চাকা ধরলো দান্তে। চিৎকার করে একটার পর একটা নির্দেশ দিতে লাগলো খালাসীদের।

একটু পরেই দেখা গেল ডুবো পাহাড়গুলোর একশো গজেরও কম দূর দিয়ে এগোচ্ছে অ্যামেলিয়া। গতি বেড়ে গেছে অনেক। ডুবো পাহাড়গুলোকে স্পর্শও করলো না জাহাজের খোল। নিরাপদে পেরিয়ে গেল দ্বীপটাকে।

'সাবাস!' চেঁচিয়ে উঠলো ক্যাপ্টেন ও অন্য নাবিকরা। প্রত্যেকেই মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে দান্তের ক্ষমতা ও দক্ষতা দেখে।

'কী মনে হয়, আমি আপনাদের কাজে লাগবো?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো দান্তে। 'লেগহর্ন পর্যন্ত কাজ করতে দেবেন আমাকে? তারপর যদি মনে করেন আমার প্রয়োজন নেই, নামিয়ে দেবেন লেগহর্নে। খাবার আর কাপড়-চোপড়ের যা দাম হয় আমি শোধ করে দেবো।'

'হ্যাঁ, তোমাকে কাজ করতে দেবো,' বললো ক্যাপ্টেন। খুশি মনেই দেবো। এবং আমার আর সব নাবিক যে হারে বেতন পায় সে হারে তোমাকে বেতনও দেবো।'

'ওকে অনেক বেশি দেয়া উচিত, স্যার,' জাকোপো বললো। 'ওর মতো দক্ষ নাবিক আমাদের জাহাজে আর নেই।'

'সে দেখা যাবে। আগে ওর জন্যে কিছু কাপড়ের ব্যবস্থা কর।'

'আমারগুলোই লাগবে মনে হয়।' বলে এক দৌড়ে নিচে চলে গেল জাকোপো। ফিরে এলো একটু পরেই। হাতে কয়েকটা কাপড়। দান্তে পরে নিলো ওগুলো।

'খিদে পেয়েছে?' দান্তেকে জিজ্ঞেস করলো জাকোপো।

'মানে! খিদে পিপাসায় মরতে বসেছি!'

খাবার এবং মদ এনে দিলো ওকে নাবিকরা। প্রথমে পান করলো দান্তে। তারপর নেকড়ের মতো হামলে পড়লো খাবারের ওপর।

'আস্তে! আস্তে!' সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে পরামর্শ দিলো জাকোপো।

ঠিক সেই সময় দূর থেকে ভেসে এলো ভয়ঙ্কর এক আওয়াজ। শ্যাতো দ্'ইফ-এর চূড়ার বিশাল ঘণ্টাটা বাজছে। ঘোষণা করছে—একজন কয়েদী পালিয়েছে!

'ও কীসের শব্দ?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাপ্টেন।

দান্তের হাতে তখন মদের গ্লাস। হাতটা একটুও কাঁপলো না ওর। জবাব দিলো, 'শ্যাতো দ্'ইফ-এর ঘণ্টা। কোনও কয়েদী বোধহয় পালিয়েছে।'

তীক্ষ্ণ চোখে দান্তের দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন। গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে দান্তে। কী বুঝলো ক্যাপ্টেন কে জানে, মুখে কিছু বললো না। মনে মনে হয়তো ভাবলো, 'যাকগে, আমার কী? লোকটা দক্ষ নাবিক, ওকে এই মুহূর্তে দরকার আমার।'

খাওয়া শেষ করে ফোকাস্‌লে ঢুকলো দান্তে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। বার্থে উঠে শুয়ে পড়লো। ভয়ানক ক্লান্ত, তবু তক্ষুণি তার ঘুম এলো না। দুঃখ আর আনন্দ মেশানো অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মন। আনন্দ মুক্তির। দুঃখ; এখনো বাবা, মার্সিডিসের কাছ থেকে অনেক দূরে ও। কোথায় ওরা? কী করছে এখন? বাবা কি বেঁচে আছে এখনো? আর মার্সিডিস? এখনো কি ওর অপেক্ষায় আছে? ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে গেল দান্তে। অ্যামেলিয়া তখন পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে লেগহর্নের দিকে।

সতেরো

অ্যামেলিয়া জাহাজের সবাই চোরাচালানী। ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে খালাসী এমনকি কেবিন বয় পর্যন্ত। রাতের অন্ধকারে নির্জন উপকূলে মাল খালাস করে তারা। কখনো কখনো ওঠায়। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, তবে লাভজনকও।

খুব শিগগিরই দান্তে টের পেলো ব্যাপারটা। এবং খুশি মনেই ভিড়ে গেল চোরাচালানির সঙ্গে। লেগহর্নে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ক্যাপ্টেনের ডান হাত হয়ে উঠলো ও। নাবিকরা সবাই পছন্দ করে ওকে, সম্মান করে, মানে। জাকোপো সব

সময় আপন ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে ওর সাথে।

লেগহর্নে পৌঁছুলো জাহাজ। কয়েক ঘন্টার জন্যে তীরে নামলো দান্তে। মিশে গেল বন্দরের প্রাণবন্ত, মুক্ত মানুষদের ভীড়ে। ও-ও মুক্ত আজ। আহ, কী খুশি যে লাগছে। খামোকা কিছুক্ষণ ঘুরলো দান্তে বন্দরের পথে পথে। তারপর ঢুকলো এক নাপিতের দোকানে। দাড়ি কামালো, দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর। চুল ছাঁটলো।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল দান্তে। নিজের চেহারাই নিজের কাছে অপরিচিত লাগছে। সত্যিই কি আয়নায় যার প্রতিবিম্ব পড়েছে সে ও? শ্যাতো দ'ইফ-এর বছরগুলো সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে ওর চেহারা। মুখটা আগের চেয়ে অনেক সরু হয়ে গেছে, ফলে লম্বাটে দেখাচ্ছে। চোয়ালগুলো দৃঢ়। চোখ দুটো অনেকখানি ঢুকে গেছে কোটরের ভেতর। দীর্ঘদিন কারাগারের আঁধারে থেকে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ত্বক। গলার স্বরও বদলেছে কিছুটা। এখন অনেক ধীরে, নরম করে কথা বলে ও। হাঁটার ভঙ্গিও বদলে গেছে। একটু যেন কুঁজো হয়ে হাঁটে। এখন কি ওর বাবা বা মার্সিডিস চিনতে পারবে ওকে?

নাপিতের দোকান থেকে বেরিয়ে দরজির দোকানে গেল দান্তে। চমৎকার এক প্রস্থ পোশাক কিনলো। যখন জাহাজে ফিরে এলো তখন ও অন্য মানুষ।

সে রাতেই নির্জন এক সৈকতে গোপনে মাল নামানো হলো।

নতুন কিছু চোরাই মাল তোলা হলো। তারপর আবার রওনা হলো জাহাজ। এবার প্রথমে এলবা এবং পরে কর্সিকায় যাবে অ্যামেলিয়া।

এলবা পেরিয়ে এসেছে ওরা। জাহাজ এখন পিনোসা দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। সামনের দ্বীপটা মন্টিক্রিস্টো! মন্টিক্রিস্টো! মাত্র চার মাইল দূরে!

ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে দান্তে। দ্বীপটার যতটুকু দেখা যায় সবটাই যেন গিলে ফেলবে ওর চোখ। একবার ভাবলো লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে যাবে স্বপ্নের দ্বীপটার কাছে। পরমুহূর্তে মনে হলো, উচিত হবে না কাজটা। যারা ওকে উদ্ধার করেছে, সাহায্য করেছে তাদের ফেলে চলে যাবে? তাছাড়া শেষ পর্যন্ত যদি গুপ্তধন পেয়েই যায়, একা ও সেগুলো সরাবে কী করে দ্বীপ থেকে? না! অপেক্ষা করবে ও। ধৈর্য ধরবে। কী করে ধৈর্য ধরতে হয় তা ও শিখেছে কারাগারে থাকতে। ফারিয়ার উদাহরণ আছে সামনে।

এছাড়া আরো কিছু প্রশ্ন দেখা দিলো দান্তের মনে: কী করে ও নিশ্চিত হচ্ছে, গুপ্তধন পাওয়াই যাবে ওই দ্বীপে? গুপ্তধনের ব্যাপারটা ফারিয়ার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনাও তো হতে পারে! নাকি সিজার স্পাডার চিরকুটে যা লেখা সব সত্যি এবং বাস্তব? প্রশ্নগুলোর কোনও জবাব পেলো না দান্তে। সুতরাং আপাতত ধৈর্য ধারণ করা-ই যুক্তিযুক্ত মনে করলো ও।

মন্টিক্রিস্টোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চললো জাহাজ। নেপোলিয়নের জন্মভূমি কর্সিকায় পৌঁছুলো। চোরাই মালপত্র গোপনে, নিরাপদে নামিয়ে দেয়া হলো। তারপর লেগহর্ন-এ ফিরে এলো অ্যামেলিয়া।

লেগহর্ন-এ তখন বিপজ্জনক এক কাজ অপেক্ষা করছে ক্যাপ্টেনের জন্যে।

গভীর সাগরে এক তুর্কী জাহাজ থেকে চোরাই রেশমী কাপড় তুলে ফ্রান্সে নিয়ে গিয়ে কোনও এক নির্জন সৈকতে নামিয়ে দিতে হবে।

কিছুক্ষণ ভাবলো ক্যাপ্টেন। কাজটায় ঝুঁকি খুব বেশি, সেই সঙ্গে লাভের অঙ্কটাও লোভনীয়। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সে। তুর্কী জাহাজটার সাথে কোথায় নিরাপদে মিলিত হওয়া যায় সেটাই সমস্যা। অনেক, অনেকক্ষণ একা একা ভাবলো ক্যাপ্টেন। অবশেষে দান্তের পরামর্শ চাইলো।

'আমার মনে হয়, মন্টিক্রিস্টোই সবচেয়ে ভালো জায়গা,' বললো ক্যাপ্টেন। 'এ তল্লাটে ওর চেয়ে নিরাপদ দ্বীপ আর নেই। কোনও মানুষ বাস করে না ওখানে, কেউ যায় না। তোমার কী মনে হয়?'

শোনামাত্র আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে দান্তের হৃদয়। অনেকক্ষণ কোনও জবাব দিতে পারলো না ও।

'কী বলো?' আবার জিজ্ঞেস করলো ক্যাপ্টেন। জায়গাটা পছন্দ হচ্ছে না…?'

'আমিও ভেবে দেখলাম,' শান্তকণ্ঠে বললো দান্তে, 'মন্টিক্রিস্টোই সবচেয়ে ভালো। এবং আমার মতে আজ রাতেই আমাদের রওনা হওয়া উচিত।'

সেরাতেই রওনা হলো অ্যামেলিয়া লেগহর্ন থেকে মন্টিক্রিস্টোর পথে। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর ওরা পৌঁছে যাবে ওখানে!

রাতে ভালো মতো ঘুমাতে পারলো না দান্তে। স্মৃতি, চিন্তা আর আশা আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওর মন। সকালের দিকে একটু তন্দ্রামতো এলো। তন্দ্রার ঘোরে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলো দান্তে। একটা গুহার ভেতর রয়েছে ও। গুহার দেয়ালগুলো সোনার। হিরা, মুক্তা, চুনী, পান্না—নানা রকম মূল্যবান রত্ন বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে ওর চারপাশে। উন্মাদের মতো কুড়াচ্ছে ও। সবগুলো পকেট ভর্তি হয়ে যেতে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো দান্তে। এবং তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলো, রত্নগুলো আর কিছুই নয়, নেহায়েত সাদা পাথর। অস্থির হয়ে আবার গুহার দিকে দৌড়ালো ও। কিন্তু পথ খুঁজে পেলো না। একটু পরে মনে হলো নড়তে পারছে না ও। ভারি কিছু একটার সঙ্গে আটকে দেয়া হয়েছে ওর পা। প্রাণপণে হাঁটার চেষ্টা করলো দান্তে। পারলো না। এই সময় ভেঙে গেল ঘুম। ঘামে ভিজে গেছে সারা গা। বিছানা থেকে নেমে ডেকের মুক্ত বাতাসে ছুটে গেল ও।

পূর্ণ বেগে এগোচ্ছে জাহাজ। সবগুলো পাল ফুলে উঠেছে বাতাস লেগে।

সকাল নাগাদ এলবা পেরিয়ে গেল অ্যামেলিয়া। তারপর পিনোসা। বিকেলের দিকে দূরে দেখা গেল মন্টিক্রিস্টোকে। সূর্য ডুবতে ডুবতে পরিষ্কার দেখা যাবে দ্বীপটাকে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো দান্তের। কিছুতেই উত্তেজনা দমন করতে পারছে না ও।

নীল সাগরকে কালো করে দিয়ে রাত নামলো। মন্টিক্রিস্টোর উপকূলে নোঙর ফেললো অ্যামেলিয়া। এখানেই তুর্কী জাহাজটার জন্যে অপেক্ষা করবে ওরা।

জাকোপো আর দান্তে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের এক পাশে রেলিং-এ হেলান দিয়ে। দু'জনেই তাকিয়ে ছোট্ট পাহাড়ী দ্বীপটার দিকে। অদ্ভুত এক জ্বলজ্বলে দৃষ্টি দান্তের চোখে।

'রাতটা কোথায় কাটাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করলো সে।
'কেন, জাহাজে!'
'আজ রাতে তীরে গিয়ে ঘুমালে হয় না?'
'তীরে ঘুমানোর জায়গা পাবে কোথায়?'
'পাহাড়ের গায়ে কোনও গুহাটুহা নেই?'
'আমি যতটুকু জানি নেই।'
'ধৈর্য ধরতে হবে, এডমণ্ড দান্তে, ধৈর্য ধরতে হবে,' মনে মনে নিজেকে শোনালো দান্তে।
খুব বেশিক্ষণ পরে নয়, তুর্কী জাহাজটাকে দেখা গেল। ধীরে ধীরে অ্যামেলিয়ার কাছাকাছি এসে গেল সেটা। নোঙর ফেললো। একটু পরে একটা নৌকা নামানো হলো সেই জাহাজ থেকে। আরও একটু পরে অ্যামেলিয়ার গায়ে এসে ভিড়লো নৌকা। ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ব্যস্ত হয়ে উঠলো দান্তে, জাকোপো আর তাদের সহকর্মী নাবিকরা। নৌকা থেকে মাল খালাস করে অ্যামেলিয়ায় তুলতে লাগলো ওরা।
প্রথম নৌকার মাল অ্যামেলিয়ায় তোলা হতেই দ্বিতীয় একটা নৌকা এলো। তারপর তৃতীয়। অবশেষে শেষ হলো কাজ। নোঙর তুলে রওনা হয়ে গেল তুর্কী জাহাজ। রাতের মতো যেখানে আছে সেখানেই থাকবে অ্যামেলিয়া। কাল ভোরে রওনা হবে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে।
হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লো অ্যামেলিয়ার নাবিকরা। কিন্তু দান্তের চোখে ঘুম নেই। নানা চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথার ভেতরে। ওর সঙ্গীদের কেউ কি জেনে গেছে গুপ্তধনের কথা? ওর গত কয়েক দিনের আচরণ কি সবার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে? ঘুমের ভেতর কি কিছু বলে ফেলেছে? অথবা জাকোপোর কাছে কখনো কি অসাবধানে সন্দেহ করার মতো কিছু বলেছে?
ভোর হওয়ার আগেই উঠে পড়লো দান্তে।
'আমি একটু তীরে যাচ্ছি,' বললো ও, 'কিছু শিকার পাই কিনা দেখি। জাহাজ ছাড়ার আগেই ফিরে আসবো।'
ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হলো না কারো কাছে। সবাই জানে, এমন নির্জন দ্বীপে শিকার করার সুযোগ কোনও অভিযানপ্রিয় মানুষ ছাড়তে চাইবে না। একজন কেবল বললো, 'আমাদের দান্তের আবার শিকারের নেশা আছে জানতাম না তো!'
'আমি যাই তোমার সঙ্গে?' জাকোপো বললো।
'দরকার নেই,' জবাব দিলো দান্তে। 'সাথী থাকলে শিকারের রোমাঞ্চটা ঠিক উপভোগ করা যায় না।'
একটু ক্ষুণ্ন হলেও আর কিছু বললো না জাকোপো।
জাহাজের কিনার থেকে টুপ করে জলে লাফিয়ে পড়লো দান্তে। সাঁতরে তীরে পৌঁছালো। পুব দিক কোনটা কাল সূর্য ডোবার আগেই ঠিক করে নিয়েছিলো। দেরি না করে হাঁটতে শুরু করলো। অবশেষে পৌঁছালো 'পুবদিকের সেই ছোট্ট উপসাগর'-এর তীরে। ইতোমধ্যে সকাল হয়েছে। পেছন ফিরে দান্তে দেখলো

লাল থালার মতো সূর্যটা বেরিয়ে আসছে দূর সাগরের তল থেকে।

প্রথমে একটা পাথুরে পাহাড়ে উঠলো দান্তে। চারপাশটা দেখে নিলো ভালো করে। ঠিক করে নিলো কোনখান থেকে শুরু করে কোনদিকে এগোবে।

পাহাড় থেকে নেমে শুকনো একটা ঝরনার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো ও। দু'পাশে উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের দেয়াল। যেতে যেতে সতর্কভাবে পরীক্ষা করছে পাথরগুলো। কয়েকটা পাথর পরীক্ষা করেই ও বুঝতে পারলো কোনও কোনও পাথরে মানুষের হাতে খোদাই করা চিহ্ন দেয়া আছে। চিহ্নগুলো যে সিজার স্পাডা দিয়েছিলো তাতে কোনও সন্দেহ রইলো না দান্তের।

চিহ্ন দেয়া পাথর খুঁজে বের করা খুব সহজ হচ্ছে না। ঝোপ-ঝাড় আর ঘাসে ঢাকা পড়ে গেছে অনেকগুলো। যাহোক, একটা…দুটো…তিনটে… করে গুণে অবশেষে বাইশতম পাথরটার কাছে পৌঁছুলো ও। সঙ্গে সঙ্গে দমে গেল দান্তের বুক। পাথরটা এত বড় যে কোনও মানুষের পক্ষে ওটা ওখানে রাখা সম্ভব নয়। ওর নিচে গুপ্তধন থাকার সম্ভাবনাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না দান্তের। যে পাথর মানুষের পক্ষে নাড়ানো অসম্ভব তার নিচে ধন সম্পদ লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় কী করে?

কোথাও ভুল হয়েছে, বুঝতে পারলো দান্তে। আবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তার আগে বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে হবে ওকে।

ঘুরে দাঁড়ালো দান্তে।

আঠারো

অ্যামেলিয়ার নাবিকরা সবাই তীরে নেমে এসেছে। খাওয়া দাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। দান্তেকে দেখতে পেলো ওরা। পাহাড়ী ছাগলের মতো পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে।

'জলদি এসো,' চেঁচিয়ে উঠলো নাবিকরা।

হাত উঁচু করে একটা ভঙ্গি করলো দান্তে; যার অর্থ হতে পারে, 'দাঁড়াও, এই এলাম বলে।' পরমুহূর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ও। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে।

সবাই ছুটলো ওর দিকে। জাকোপো পৌঁছুলো প্রথমে। দেখলো, নিস্পন্দ পড়ে আছে দান্তে। মরে গেল নাকি? না, যন্ত্রণাকাতর একটা আওয়াজ করে চোখ মেলেছে। উঠে বসার চেষ্টা করলো। পারলো না। আবার আর্তনাদ করে শুয়ে পড়লো দান্তে।

'পা দুটো…উহ্, মাথাটা…,' দুর্বল কণ্ঠে বললো ও।

'নোড়ো না। তুমি শুয়ে থাকো,' নাবিকদের কয়েকজন বললো। 'আমরা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।' দান্তেকে ধরার জন্যে এগোলো ওরা।

'না না!' চিৎকার করে উঠলো দান্তে। 'মরে যাবো! মরে যাবো! আমাকে ছুঁয়ো

না। যেখানে আছি সেখানেই থাকতে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যে ভালো হয়ে যাবো।'

থেমে গেল নাবিকরা। একটু পরে অনেক কষ্টে উঠে বসলো দান্তে। সামান্য নড়ে একটা পাথরে হেলান দিলো। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁচকে আছে ওর চোখমুখ। দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো একবার, পারলো না।

ইতোমধ্যে ক্যাপ্টেনও এসে পড়েছে।

'শুধু পা নয়, শরীরের ভেতরেও বোধহয় জখম হয়েছে।' উদ্বিগ্ন শোনালো তার গলা। দান্তের দিকে ফিরে য়োগ করলো, 'আজ সকালেই আমাদের রওনা হয়ে যেতে হবে। কিন্তু, তোমাকে তো এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না। একটু মুখ বুজে থাকো, আমরা ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।'

'না! না! ব্যথায় মরে যাবো!' আর্তনাদ করে উঠলো দান্তে। 'আমাকে এখানেই রেখে যান। মরলে এখানেই মরবো, এ ব্যথা সহ্য করতে পারবো না।'

'তাহলে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করি আমরা,' চিন্তিত গলায় বললো ক্যাপ্টেন। 'ততক্ষণে তুমি বোধহয় একটু সুস্থ বোধ করবে।'

নাবিকরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। এর আগে কখনো কোনও পরিস্থিতিতেই জাহাজ ছাড়তে দেরি করেনি ক্যাপ্টেন। দান্তেও জানে সেকথা। অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞ বোধ করলো ও ক্যাপ্টেনের কাছে।

'না!' বললো দান্তে। 'আমার জন্যে এত বড় একটা ঝুঁকি আপনি নিতে পারেন না। আমার দোষে আমি ব্যথা পেয়েছি। আপনাদের কোনও দায় দায়িত্ব নেই এতে। এখুনি রওনা হয়ে যান আপনারা। আমার জন্যে কিছু খাবার, একটা বন্দুক আর একটা কুড়াল রেখে যান, তাতেই হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে যাত্রার জন্যে তৈরি জাহাজটার দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন।

'ঠিকই বলেছো, আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়। কিন্তু…কিন্তু তোমাকে এখানে এভাবে ফেলে…'

'ব্যস, আর কোনও কথা নয়, চলে যান!'

'হয়তো সপ্তা খানেক লাগবে আমাদের ফিরে আসতে…'

'দরকার নেই ফিরে আসার, পথে কোনও জেলে নৌকা দেখলে বলে দেবেন, আমাকে যেন তুলে নেয়। ভালো হতে যে ক'দিন লাগে, তারপর লেগহর্নে আপনাদের সাথে দেখা করবো আমি।'

'না! না! এডমণ্ড, তোমাকে এখানে একা ফেলে যেতে পারবো না আমি,' কাতর কণ্ঠে বললো জাকোপো। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে যোগ করলো, 'ক্যাপ্টেন, স্যার, অনুমতি দিন, আমি ওর সাথে থাকি।'

'জাকোপো!' সবিনয়ে বললো দান্তে, 'আমার জন্যে তুমি এ-কাজ করবে? তোমার লাভের ভাগ ছেড়ে দেবে!'

'হ্যাঁ।'

'ওহ্ জাকোপো! তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু আমার জন্যে তুমি এতখানি ক্ষতি স্বীকার করবে তা আমি কী করে মেনে নেবো? না, জাকোপো, কাউকে থাকতে হবে না আমার সাথে। তুমি যাও। এক দুদিনের ভেতর আমি ভালো হয়ে যাবো, তারপর তো তোমরা ফিরেই আসবে।

যদি না-ও আসো অন্য কোনও জাহাজ বা নৌকাকে বলে যাবে। তবে আর চিন্তা কী?'

আরো কিছুক্ষণ তর্ক করার চেষ্টা করলো ওর সাথে ক্যাপ্টেন, জাকোপো। কিন্তু কিছুতেই শুনলো না দান্তে। ওর সেই এক কথা—কাউকে থাকতে হবে না; ওর জন্যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা ও চায় না।

অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিলো ওরা। যাওয়ার সময় বারবার পেছন ফিরে দেখতে লাগলো ওকে।

নৌকায় উঠলো নাবিকরা। ধীরে ধীরে নৌকা গিয়ে ভিড়লো জাহাজের গায়ে। নাবিকরা সবাই উঠে পড়লো। নৌকাটাকেও তুলে ফেলা হলো জাহাজে। একটু পরেই বিরাট এক সাদা পাখির মতো পাল তুলে দিলো অ্যামেলিয়া।

যতক্ষণ না ওটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ততক্ষণ যেমন ছিলো তেমনি বসে রইলো দান্তে। তারপর তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলো সিজার স্পাডার বাইশতম পাথরের দিকে।

আবার শুরু করলো দান্তে। 'পুব দিকের সেই ছোট্ট উপসাগর,' যেখানে কয়েক শতাব্দী আগে নোঙর ফেলেছিলো সিজার স্পাডা সেখান থেকে। এক, দুই, তিন করে গুণে আবার বাইশতম পাথরটার কাছে পৌছুলো। না, ভুল হয়নি আগেরবার, এটার কাছেই এসেছিলো ও।

বিশাল পাথরটা। এত বড় যে বিশজনের পক্ষেও নাড়ানো সম্ভব কিনা সন্দেহ। তাহলে? এই পাথরের নিচে কী করে সব ধন সম্পদ লুকালো সিজার স্পাডা?

বসে বসে ভাবতে লাগলো দান্তে। পাথরটা কি তুলে এনে বসানো হয়েছে? নাকি এমনভাবে ঠেলে দেয়া হয়েছিলো যাতে ঠিক এখানে এসে বসে? দেখা যাক কোনটা ঠিক। ওর হাতে এখন প্রচুর সময়, ঠিকই বের করে ফেলবে কারণটা।

পাথরটার ওপাশে নিচু একটা পাহাড়ে উঠলো ও। চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারলো ওর পরের ধারণাটাই ঠিক। গড়িয়ে আনা হয়েছে পাথরটা। এবং এখন যেখানে ও দাঁড়িয়ে আছে এককালে তারই কাছাকাছি কোথাও ছিলো ওটা। গড়িয়ে নেয়ার জন্যে যে পথ তৈরি করা হয়েছিলো সেটা দেখতে পেলো। নেমে এলো দান্তে। পাথরটার কাছে এসে দাঁড়ালো। ওটা যেন আরো গড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্যে কোনায় ঠেকা দেয়া ছোট ছোট কয়েকটা পাথর দেখতে পেলো। ধারণাটা বিশ্বাসে পরিণত হলো ওর।

এবার ভালো মতো পাথরটার চারপাশ পরীক্ষা করলো দান্তে। দেখলো লুকানো স্থানটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েনি পাথরটায়। এক পাশে খানিকটা জায়গা নুড়ি আর মাটিতে ভর্তি। কুঠার এবং হাত চালিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললো দান্তে। ফুট তিনেক গভীর একটা গর্ত খুঁড়লো। এরপর কুঠার দিয়ে শক্ত একটা গাছ কেটে নিয়ে ডালপালা ছাড়িয়ে সমান করে নিলো কাণ্ডটা। ছ'ফুট লম্বা আর ওর হাতের সমান মোটা একটা দণ্ড তৈরি হলো।

ঠেকা দেয়া ছোট পাথরগুলো সরিয়ে ফেললো প্রথমে। তারপর গর্তের ভেতর

দণ্ডের এক মাথা ঢুকিয়ে সর্বশক্তিতে চাড় দিলো ও। সামান্য যেন নড়লো পাথরটা। আবার চাড় দিলো। আবার একটু নড়লো পাথর।

বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিলো দান্তে। আবার লাগলো কাজে। দাঁতে দাঁত চেপে চাড় দিলো দণ্ডটা পাথরে বাধিয়ে। নড়ে উঠলো বিরাট পাথর। চাপ দিয়ে চললো দান্তে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আলগা হয়ে ঢালুর দিকে গড়িয়ে যেতে শুরু করলো পাথরটা। অবশেষে ঢালের শেষ প্রান্তে আরেকটা বড় পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল ওটা।

পাথরটা সরে যাওয়ায় একটা গর্তের মুখ অনাবৃত হয়ে পড়েছে। চৌকোনা একটা পাথর দেখতে পেলো দান্তে সেটার ভেতর। মাঝামাঝি জায়গায় লোহার আংটা লাগানো। উত্তেজনায় টগবগ করে উঠলো দান্তের হৃদয়। পেয়েছে! সত্যিই তাহলে এটাই গুপ্তধন লুকানো জায়গা!

দণ্ডটার এক মাথা আংটার ভেতর ঢুকিয়ে আবার চাপ দিলো দান্তে। খুলে গেল পাথরটা। নিচে তাকালো ও। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে অন্ধকার পাতালের দিকে।

হ্যাঁ, পেয়েছে দান্তে গুপ্তধন লুকানো জায়গা। ঢিপঢিপ করছে বুকের ভেতর। সংশয়ের দোলায় দুলছে মন। স্পাডাদের ধন সম্পদ আছে তো এর ভেতর? নাকি ওর আগেই কেউ এসে নিয়ে গেছে? সিজার বরগিয়াই হয়তো···। দেখা যাক···।

সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলো দান্তে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আশা করেছিলো ও মাটির নিচে। কিন্তু দেখলো, আবছাভাবে আলোকিত গুহাটা। পাথুরে ছাদের কতকগুলো গর্ত দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে। নীল আকাশ এবং সবুজ গাছের ডালপালা দেখতে পেলো দান্তে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ও। আবছা আলো চোখে সয়ে আসতেই ঘরের কোনার দিকে এগোলো। 'উত্তর পুব কোনায় আছে ধন রত্ন,' সিজার স্পাডা লিখে গিয়েছেন। কিন্তু সেখানে কিছুই দেখতে পেলো না দান্তে, যদিও পাথরের দেয়াল রত্নের মতোই জ্বলজ্বল করছে। এগুলোই কি স্পাডার ধনরত্ন?

না! হঠাৎ দান্তের মনে পড়ে গেল, সিজার স্পাডা লিখেছিলেন, 'দেয়াল ভেঙে দ্বিতীয় কামরায় ঢুকতে হবে।' এখন যেখানে ও আছে সেটা নিশ্চয়ই প্রথম কামরা। কুঠারটা তুলে নিলো ও। দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ঘা দিয়ে চললো। নিরেট পাথরের ওপর ঘা মারলে যেমন হয় তেমন শব্দ হচ্ছে ঠক-ঠক-ঠক। হঠাৎ এক জায়গায় শব্দটা অন্য রকম শোনালো। কেমন যেন ফাঁপা ভোঁতা আওয়াজ—ঢপ! সন্দেহ নেই, এই জায়গায় দেয়াল নিরেট নয়। এবার প্রচণ্ড জোরে আঘাত করতে লাগলো দান্তে। একটু পরেই ভেঙে গেল দেয়াল। ছোট একটা গর্ত তৈরি হয়েছে। আরো কিছুক্ষণ কুড়াল চালিয়ে গর্তটা একজন মানুষের ঢোকা-বেরোনোর মতো বড় করলো দান্তে। তারপর দুরু দুরু বুকে ঢুকলো দ্বিতীয় কামরায়।

অকস্মাৎ অদ্ভুত এক দুর্বলতায় আক্রান্ত হলো দান্তে। পা দুটো কাঁপছে। একটু পরেই অনুভব করলো, শুধু পা নয়, সারা শরীর কাঁপছে থরথরিয়ে, মাথা ঘুরছে। ওর মনে হলো, জ্ঞান হারাবে। আতঙ্কিতের মতো এক ছুটে বেরিয়ে এলো দান্তে গুহা ছেড়ে। ধুপধাপ পায়ে সিঁড়ি টপকালো। মুক্ত বাতাসে এসে বুক ভরে

দম নিলো। সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে নীল আকাশের দিকে চোখ মেলে দিলো ও।

চারদিক শান্ত। কোথাও কোনও শব্দ নেই। একটু একটু করে শক্তি ফিরে পেলো দান্তে। উঠে খানিকটা পানি খেলো। খিদে পায়নি, তবু শক্তি সংগ্রহের জন্যে খেয়ে নিলো কিছু। তারপর আবার নেমে এলো সেই গুহায়।

দ্বিতীয় কামরাটা অন্ধকার। ভেজা মাটির গন্ধ। শ্যাতো দ্'ইফ-এর অন্ধ কুঠুরিতে থেকে অভ্যস্ত দান্তে। অন্ধকার কোনও অসুবিধা করতে পারলো না ওর। ভুরু কুঁচকে এগিয়ে গেল উত্তর পুব কোণে। কিছুই নেই সেখানে!

'নিশ্চয়ই মাটিতে পোঁতা রয়েছে রত্নগুলো,' ভেবে খুঁড়তে শুরু করলো দান্তে।

ফুটখানেক গভীর একটা গর্ত খুঁড়লো। কিছু পাওয়া গেল না। খুঁড়ে চললো ও। হঠাৎ কাঠের কিছু একটায় আঘাত করলো দান্তের কুঠার। কাঠ! মানে বাক্স! রত্নভর্তি! খুঁড়ে চললো ও। এখন চারপাশেও বড় করছে গর্তটা। একটু পরে লোহার সঙ্গে লাগলো কুঠার। লোহার বন্ধনী লাগানো বাক্সে!

ঠিক ওই মুহূর্তে দান্তের মনে হলো, একটা ছায়া যেন সরে গেল গুহার মুখ থেকে। কে? তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বিদ্যুৎগতিতে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে এলো ও। তারপরই হো-হো করে হেসে উঠতে হলো ওকে। ছায়ার মালিক আর কেউ নয়, নির্বিরোধী নিরীহ এক বুনো ছাগল। নিশ্চিন্তে চরে বেড়াচ্ছে ঘাসের ওপর।

মাটির নিচে গুহায় ফিরে আসার আগে একটা গাছ থেকে শুকনো একটা ডাল ভেঙে নিলো দান্তে। দ্বিতীয় কামরায় ঢুকে মাটিতে গাড়লো ওটা খাড়া করে। তারপর এমনভাবে আগুন জ্বাললো যেন মশালের মতো জ্বলে।

আলোকিত হয়ে উঠলো অন্ধকার কামরা। বাক্সটার দিকে তাকালো দান্তে। ডালার ঠিক মাঝখানে একটা রূপার চাকতি। তার ওপর খোদাই করা স্পাডা পরিবারের চিহ্ন। আর কোনও সন্দেহ রইলো না ওর, এই বাক্সেই আছে গুপ্তধন।

গর্ত থেকে বাক্সটা টেনে তোলার চেষ্টা করলো দান্তে। পারলো না। শক্ত হয়ে এঁটে আছে মাটির সাথে। শেষে কুঠারের ঘায়ে ভেঙে ফেললো তালা। হাত দিয়ে টেনে ওঠালো ডালাটা।

শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল দান্তের। চোখ কপালে উঠে গেছে। এত মূল্যবান জিনিস জীবনে কখনো এক সাথে দেখেনি ও। এ কী সত্যি না স্বপ্ন!

তিনটে ভাগ বাক্সটায়। প্রথম ভাগে ঠাসা সোনার মোহর। দ্বিতীয়টায় থরেথরে সাজানো সোনার ইট। আর তৃতীয় ভাগটা ভর্তি নানান রকম রত্নে। হিরা, চুনী, পান্না। মুঠো ভরে তুলে নিলো দান্তে অমূল্য রত্ন। ছড়িয়ে ফেললো মাটিতে। না, সাদা পাথরে পরিণত হলো না একটাও! সব খাঁটি! স্বপ্ন দেখছে না ও!

পাগলের মতো ওপরে উঠে এলো দান্তে। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার চূড়ায় উঠে দু'হাত তুলে দিলো আকাশে। সমস্ত অন্তর দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালো ঈশ্বরকে। তারপর আবার ফিরে এলো গুহায়।

সন্ধ্যার দিকে বেরিয়ে এলো ও মাটির নিচের কামরা থেকে। এখন অনেক শান্ত দেখাচ্ছে ওকে। জাহাজী বন্ধুদের রেখে যাওয়া খাবার থেকে খেয়ে নিলো

খানিকটা। পানি খেলো। তারপর শুয়ে পড়লো সুড়ঙ্গের মুখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল দান্তে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টায় চড়লো ও। চারপাশে তাকালো—একটাও বাড়ি-ঘর চোখে পড়লো না। জনবসতির কোনও চিহ্নই নেই। দ্বীপের উঁচু অংশ কেবল পাথরে গড়া; নিচু অংশে গাছপালা আছে। আছে ঝোপ-ঝাড়, ঘাস। অগুনতি পাখি দেখলো দান্তে, আকাশে উড়ছে, গাছের ডালে বসে আছে। ছাগল ছাড়াও বুনো হরিণ, খরগোশ দেখতে পেলো, ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্ছে।

নেমে এলো দান্তে। খাওয়া দাওয়া করে ঢুকলো গুপ্তধন লুকানো গুহায়। সামান্য কিছু মূল্যবান রত্ন ভরে নিলো পকেটে। তারপর বাক্সের ডালা নামিয়ে মাটি চাপা দিয়ে বেরিয়ে এলো। আংটা লাগানো চৌকোনা পাথরটা বসিয়ে দিলো জায়গামতো। তার ওপরে টেনে হিঁচড়ে এনে বসালো আরেকটা পাথর। মাটি দিয়ে পাথরটা ঢেকে দিলো দান্তে। দ্রুত বাড়ে এমন কিছু গাছ লাগিয়ে দিলো সেখানে। সাবধানে ওর উপস্থিতির প্রতিটা চিহ্ন নষ্ট করলো। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলো অ্যামেলিয়ার ফিরে আসার জন্য।

ছ'দিন পর দূর সমুদ্রে দেখা গেল অ্যামেলিয়াকে। ধীরে ধীরে উপকূলের কাছে চলে এলো জাহাজ। নোঙর ফেললো। নৌকায় করে ক্যাপ্টেন, জাকোপো এবং আরো কয়েকজন নাবিক তীরে এলো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওদের দিকে এগিয়ে গেল দান্তে। জানালো, ভালো হয়ে গেছে ও, যদিও পা দুটো এখনো বেশ ভোগাচ্ছে।

জাকোপো বললো, সাফল্যের সঙ্গে ওরা রেশমী কাপড়গুলো নামিয়ে দিয়ে আসতে পেরেছে। মার্সেই-এর কাছে এক নির্জন সৈকতে কাজটা সেরেছে ওরা। মাল নামিয়ে যখন ফিরে আসছে তখন নৌবাহিনীর এক জাহাজ টের পেয়ে তাড়া করে ওদের। প্রায় ধরে ফেলেছিলো, এই সময় ঝড় ওঠায় বেঁচে গেছে ওরা। নৌবাহিনীর জাহাজটা কাছের এক উপসাগরে গিয়ে আশ্রয় নেয় এই ফাঁকে ওরা জাহাজ চালিয়ে চলে এসেছে মন্টিক্রিস্টোয়।

দেরি না করে অ্যামেলিয়ায় উঠলো দান্তে। আনন্দে পূর্ণ ওর হৃদয়। পকেট পূর্ণ মূল্যবান রত্নে। লেগহর্নের দিকে ছুটে চলেছে ও বন্ধুদের সঙ্গে।

লেগহর্নে পৌঁছেই শহরের সবচেয়ে বড় স্বর্ণকারের দোকানে গেল দান্তে। রত্নগুলো বিক্রি করলো। সাধারণ এক নাবিকের হাতে এতগুলো মূল্যবান পাথর দেখে অবাক হলো স্বর্ণকার। অবশ্য কোনও প্রশ্ন করলো না, খুব সস্তায় জিনিসগুলো কিনতে পেরেই সে খুশি। পকেটভর্তি টাকা নিয়ে রাস্তায় নামলো দান্তে।

সেদিনই ও জাকোপোকে একটা জাহাজ কিনে দিলো। নাবিকদেরকে দামী দামী উপহার কিনে দিলো, তারপর গেল ক্যাপ্টেনের কাছে। জানালো, ওর এক চাচা প্রচুর ধনসম্পদ রেখে মাত্র মারা গেছে। চাচার কোনও সন্তান না থাকায় ও-ই এখন সে সবের মালিক। এরপর বিনীত ভাবে দান্তে বললো, 'এখন তো আর আমার পক্ষে চাকরি করা সম্ভব নয়, আমাকে ছুটি দিন।'

দান্তেকে ছাড়ার কথা কল্পনাই করতে পারে না ক্যাপ্টেন। নানা ভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে ওকে জাহাজে রাখার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু লাভ হলো না। দান্তেকে এখন ধরে রাখে এমন সাধ্য কার?

উনিশ

পরদিন লেগহর্ন থেকে জেনোয়ার পথে প্রথম যে জাহাজ ছাড়লো সেটাতে চেপে বসলো দান্তে।

জেনোয়ায় পৌছে অসংখ্য মানুষের ভীড়ে মিশে গেল ও। বহুদিন পর স্বাভাবিক প্রাণবন্ত মানুষের মাঝে এসে খুব ভালো লাগছে ওর। মানুষের মুখ, রাস্তা, দোকান, জাহাজ...এই সব সাধারণ জিনিস এমন অসাধারণ আনন্দের উৎস তা কি আগে কখনো ভাবতে পেরেছিলো দান্তে?

হঠাৎ ও লক্ষ করলো, সুন্দর একটা ইয়ট পাল তুলে ভাসছে বন্দরে। ইয়টটার সম্পর্কে খোঁজ খবর শুরু করলো দান্তে। জানতে পারলো ধনী এক ইংরেজ ভদ্রলোকের জন্যে তৈরি করা হয়েছে ওটা। কেমন চলে পরীক্ষা করার জন্যে এই প্রথমবারের মতো ওটাকে জলে ভাসিয়েছে নির্মাতারা।

'আমি যেমনটা চাই ঠিক তেমন,' মনে মনে বললো দান্তে। 'ছোটখাটো। একজনই যথেষ্ট ওটা চালানোর জন্যে। খুব দ্রুতগামীও মনে হচ্ছে। তাছাড়া কী সুন্দর দেখতে!' সত্যি নীল সাগরের ওপর সুন্দর শাদা একটা পাখির মতোই লাগছে ওটাকে।

তক্ষুণি ইয়টটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের দপ্তরে হাজির হলো দান্তে।

'কত হলে বিক্রি করবেন ওটা?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলো ও।

'উঁহুঁ, বিক্রির জন্যে নয়। এক ইংরেজ ভদ্রলোক এরইমধ্যে কিনে নিয়েছেন ওটা। সবকিছু তৈরি...কাগজপত্র পর্যন্ত। এখন ভদ্রলোক এসে নিয়ে গেলেই হয়।'

'কখন নিতে আসবেন উনি?'

'মাস তিনেকের ভেতর।'

'এর ভেতর তো আরো একটা তৈরি করে ফেলতে পারবেন ওর জন্যে।'

'তা অবশ্য ঠিক...।' চিন্তিত শোনালো নির্মাতার কণ্ঠস্বর।

ইংরেজ ভদ্রলোক যা দিয়েছেন তার দ্বিগুণ দিতে চাইলো দান্তে। শেষ পর্যন্ত রাজি হলো নির্মাতা ইয়টটা বিক্রি করতে।

'কাগজপত্র সহ কিনবো আমি,' বললো দান্তে।

'তাতে কোনও অসুবিধা নেই।'

ইয়টটার সাথে সাথে একটা ইংরেজ নামও কিনলো দান্তে।

'ঠিক এমন একটা জাহাজই আমি খুঁজছিলাম অনেক দিন ধরে,' বললো ও। 'একটা জিনিসেরই কেবল অভাব আছে, সেটা আপনাদের তৈরি করে দিতে হবে। বার্থের নিচে একটা গোপন আলমারি চাই আমি। তিনটে তাক থাকতে হবে

ওতে।'

লোকটা নিশ্চয়ই কোটিপতি, ভাবলো নির্মাতা। লাখপতিদের ইচ্ছা মানেই আদেশ।

'কোনও সমস্যা হবে না,' বললো সে। 'কাল সকালে আসুন, যেমনটা চাইছেন ঠিক তেমনটাই পেয়ে যাবেন। তারপর নিশ্চয়ই একজন নাবিক লাগবে আপনার, ওটা চালানোর জন্যে। আমার জানাশোনা এক লোক আছে...'

'না, না, আমার কোনও লোক লাগবে না। আমি নিজেই নাবিক।'

নির্মাতা ভাবলো, কোটিপতি...তবে পাগল।

পরদিন সকালেই পাল তুলে দিলো দান্তে। সুন্দর ইয়টটা জেনোয়া ছেড়ে যাচ্ছে; দেখার জন্যে প্রচুর মানুষ ভীড় জমিয়েছে জেটিতে। প্রত্যেকেরই চোখে কৌতূহল। মুখে প্রশ্ন; কোথায় যাচ্ছে পাগল ইংরেজটা? এলবা? কার্সিকা? আফ্রিকা? কে বলতে পারে?

কাঁটায় কাঁটায় পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা লাগলো দান্তের মণ্টিক্রিস্টোতে পৌছুতে। পুব দিকের ছোট্ট উপসাগরে, যেখানে বহু বহু দিন আগে নোঙর ফেলেছিলেন সিজার স্পাডা সেখানে নোঙর ফেললো ও। তারপর তীরে গিয়ে উঠলো।

একটা মুহূর্তও নষ্ট করলো না দান্তে। সোজা চলে গেল গুপ্তধন লুকানো জায়গায়। দেখলো সুড়ঙ্গের মুখটা যেমন বন্ধ রেখে গিয়েছিলো তেমনই আছে। খুললো ও মুখটা। তারপর নেমে গেল নিচে। এখানেও এক—যেমন ছিলো তেমনই আছে। কোনও কিছুই স্পর্শ করেনি কেউ।

পরদিন ভোর থেকে মোহর, সোনার ইট এবং রত্নগুলো ও বয়ে আনতে লাগলো ইয়টে। সারাদিন লাগলো সম্পূর্ণ ধনরত্ন জাহাজে এনে তুলতে।

গোধূলির ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। একটু আগে স্নান সেরে ইয়টে এসে উঠেছে ক্লান্ত দান্তে। অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ভরে আছে মন। খুব খুশি লাগছে ওর। সামনে নিরুদ্বেগ, প্রাচুর্যময় জীবন। কী করে খরচ করবে ও এত টাকা?

সব ভাবনাচিন্তা ঝেঁটিয়ে দূর করে দিলো দান্তে মাথা থেকে। এখন খাওয়া দাওয়া করে ঘুম। কাল ভোরে পাল তুলে দেবে আবার। এবারের গন্তব্য...

***

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রতিশোধ

এক

বিউকেয়ার শহর আর বেলেগার্দ গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় সরাইখানাটা। সরাইওয়ালার নাম মঁসিয়ে কাদেরুশে। অনেক বছর আগে এক সময় মার্সেই বন্দরে বাস করতো সে।

রংচটা পলস্তারা খসা একটি বাড়িতে তার সরাইখানা। দরজার ওপর টিনের নামফলক। এক দিকের পেরেক খসে গেছে, বাতাসে খটাস খটাস করে বাড়ি খাচ্ছে ওটা দেয়ালে। অনেককাল আগে শেয়ালের মাথার একটা ছবি আঁকা ছিলো ওতে, এখন আর কিছু বোঝা যায় না। প্রথম দর্শনেই স্পষ্ট হয়ে যায়, খুবই দীন অবস্থা এই সরাইখানার। সরাইওয়ালা সপ্তাহে-দুসপ্তাহে একবার খরিদ্দার পায় কিনা সন্দেহ।

এক সকালে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সরাইওয়ালা নিজে। উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে একবার রাস্তার এপাশে একবার ওপাশে। কেউ আসছে না।

আসবেও না, মনে মনে বললো সরাইওয়ালা। তার মানে আজকের দিনটাও অন্য দিনগুলোর মতোই যাবে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সরাইখানার ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলে সরাইওয়ালা দেখতে পেতো, অস্পষ্ট একটা অবয়ব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বেলেগার্দের দিক থেকে। একটু পরেই অস্পষ্ট অবয়বটা স্পষ্ট হয়ে একজন অশ্বারোহীর চেহারা নিলো। দূরে ছিলো বলে খুব ধীরগতি মনে হচ্ছিলো এতক্ষণ, আসলে টগবগিয়ে ছুটে আসছে ঘোড়াটা। আরোহী একজন পাদ্রী। কালো আলখাল্লা পরে আছেন। মাথায় তিন কোনাওয়ালা টুপি।

জীর্ণ সরাইখানার সামনে পৌঁছে লাগাম টেনে ধরলেন পাদ্রী। ঘোড়া থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন ঘোড়াটাকে বাঁধার মতো কিছু একটার খোঁজে। আধভাঙা একটা দরজার হাতল দেখতে পেলেন অবশেষে। এগিয়ে গিয়ে সেটার সঙ্গে বাঁধলেন ঘোড়ার লাগাম। হাতের চাবুক দিয়ে ঘা মারলেন সরাইখানার সামনের দরজায়।

এক মিনিট পর কাদেরুশেকে দেখা গেল দরজায়। মুখে বিগলিত হাসি। নোংরা হলদেটে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

'স্বাগতম, স্যার,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'কী সৌভাগ্য আমার, আপনার মতো একজন মানুষের পা পড়েছে আমার দরজায়। বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি। ঘর দরকার?'

অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পাদ্রী সরাইওয়ালার দিকে তারপর বললেন, 'তুমি মঁসিয়ে কাদেরুশে?' ইতালীয় টান তাঁর বলার ভঙ্গিতে।

'জি।'
'এক সময় তুমি মার্সেই-এর অ্যালি দ্য মিলায় থাকতে, তাই না?'
বিস্ময় লুকাতে পারলো না সরাইওয়ালা। 'জি থাকতাম!'
'বেশ,' পাদ্রী বললেন। 'এবার তাহলে এক বোতল মদ নিয়ে এসো আমার জন্যে।'
তিন কোনাওয়ালা টুপিটা খুলে ফেললেন তিনি মাথা থেকে। কপালের ঠিক ওপরেই সাদার ছোপ লেগেছে কালো চুলগুলোয়। গায়ের চামড়া অস্বাভাবিক সাদা। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে চারপাশে একবার চোখ বুলালেন পাদ্রী।
কাদেরুশে মদ নিয়ে ফিরে আসার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, '১৮১৫-এর দিকে এডমণ্ড দান্তে বলে কোনও তরুণ নাবিককে চিনতে?'
'নিশ্চয়ই চিনতাম,' বললো সরাইওয়ালা। 'বেচারা এডমণ্ড! আপনি ওকে চেনেন! এখন কোথায় ও? বেঁচে আছে? ছাড়া পেয়েছে?'
'না, ও মারা গেছে।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পাদ্রী। তারপর বললেন, 'আমার নাম অ্যাবি বুসোয়াঁ। এডমণ্ড যখন মৃত্যুশয্যায় তখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো ওর কাছে। আমার কাছে ও শপথ করে বলেছে, ও নিরপরাধ ছিলো।'
'বেচারা! সত্যিই ও নিরপরাধ ছিলো,' বিড়বিড় করলো কাদেরুশে।
'মৃত্যুর আগে ও আমাকে অনুরোধ করেছিলো,' বলে চললেন পাদ্রী, 'ওর বন্দী হওয়ার রহস্যটা যেন উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করি।'
মুহূর্তের জন্যে সচকিত দেখালো কাদেরুশেকে।
'এক ধনী ইংরেজ,' বলে যেতে লাগলেন পাদ্রী, 'কারাগারে ওর সঙ্গে ছিলো। এডমণ্ড মারা যাওয়ার আগেই মুক্তি পায় লোকটা। মহামূল্য এক হীরক খণ্ড ছিলো তার কাছে। মুক্তি পাওয়ার সময় সে ওটা দিয়ে যায় এডমণ্ডকে। কারাগারে থাকতে একবার মারাত্মক অসুখে পড়েছিলো ইংরেজ লোকটা। তখন এডমণ্ড প্রাণ দিয়ে তার সেবা করেছিলো। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে হীরক খণ্ডটা সে দিয়ে গিয়েছিলো ওকে। এডমণ্ড ওটা নিতে চায়নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটার পীড়াপীড়িতে না নিয়েও পারেনি। এখনকার বাজার দরে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ হবে হীরাটার দাম।'
'কী সাংঘাতিক কথা!' আর্তনাদের মতো শোনালো কাদেরুশের গলা। 'তার মানে তো, বিরাট বড় ওটা!'
'আমার সঙ্গেই আছে,' বললেন পাদ্রী। 'দেখাবো তোমাকে।'
আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটা বাক্স বের করলেন তিনি। বাক্সের মুখ খুলে মেলে ধরলেন কাদেরুশের সামনে। মুহূর্তে ঝকমক করে উঠলো যেন ঘরটা। শত রেখায় দ্যুতি ঠিকরে পড়লো চার পাশে। চোখ বড় বড় হয়ে গেল কাদেরুশের। মুখ আটকে বাক্সটা আবার পকেটে চালান করে দিলেন পাদ্রী।
'এডমণ্ড এটা আমাকে দিয়ে গেছে,' তিনি বললেন। 'ও বলেছে, এক সময় নাকি খুব ঘনিষ্ঠ চার বন্ধু ছিলো ওর। একজনের নাম কাদেরুশে, একজন

দাঁগলার, একজন ফার্নান্দ আর অন্যজন সুন্দরী এক মহিলা, যার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছিলো। মেয়েটার নাম—'

'মার্সিডিস,' বললো কাদেরুশে।

'হ্যাঁ, মার্সিডিস।' একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন পাদ্রী। 'এডমণ্ড চেয়েছিলো মার্সেই-এ ফিরে গিয়ে হিরাটা বিক্রি করে যে টাকা পাবে তা সমান পাঁচ ভাগ করবে। পৃথিবীতে ওর সবচেয়ে প্রিয় পাঁচ জনকে দেবে একেক ভাগ।'

'পাঁচ ভাগ!' আশ্চর্য হলো কাদেরুশে। 'আপনি তো মাত্র চারজনের কথা বললেন!'

'যতটুকু শুনেছি, পঞ্চম জন আর নেই এ পৃথিবীতে। এডমণ্ডের বাবা...'

'ও, হ্যাঁ,' দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো কাদেরুশে। 'ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার বছরখানেক পরই মারা গেছেন বুড়ো মানুষটা।'

'কীসে মরলো?'

দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো কাদেরুশে। 'কীসে আবার? না খেতে পেয়ে।'

'না খেতে পেয়ে! আশ্চর্য! রাস্তার কুকুরকেও দয়া করে খাওয়ায় অনেকে। ওকে কেউ সাহায্য করলো না?'

'মার্সিডিস কিছুদিন করেছিলো। কিন্তু কী করে জানি ফার্নান্দের দু'চোখের বিষ হয়ে ওঠে বুড়ো। ফার্নান্দ সব সময় মেয়েটার পাশে পাশে থাকতো।' তিক্ত এক টুকরো হাসি হাসলো কাদেরুশে। 'সেই ফার্নান্দ, আপনার ভাষায় দান্তের বিশ্বস্ত বন্ধুদের একজন!'

'দান্তের বন্ধু ছিলো না ফার্নান্দ?' পকেট থেকে ছোট বাক্সটা বের করতে করতে বললেন পুরোহিত। বাক্সটার মুখ খুললেন। সরাইওয়ালার চোখ দুটো লোভে চকচক করে উঠলো।

'না,' সে বললো, 'দাঁগলার বা ফার্নান্দ কেউই দান্তের বন্ধু ছিলো না। দু'জনেই ওকে হিংসে করতো। ফার্নান্দ হিংসে করতো মার্সিডিসকে পেতে চাইতো বলে। আর দাঁগলার, ফারাও-এর ক্যাপ্টেন হতে চাইতো বলে। ওরাই তো ওকে ফাঁসিয়ে দেয়। এডমণ্ড নেপোলিয়নকে সাহায্য করছে এরকম একটা অভিযোগ করে একজন চিঠি লেখে বিচারককে, অন্যজন সেটা ডাকে দেয়।'

'কখন লেখা হয়েছিলো চিঠিটা?'

'যেদিন দান্তের বিয়ে হওয়ার কথা ছিলো তার আগের দিন। আমিও ছিলাম দাঁগলার আর ফার্নান্দের সাথে। মদ খাইয়ে প্রায় মাতাল করে ফেলেছিলো আমাকে। তবু আমি চেষ্টা করেছিলাম ওদের ঠেকাতে। ওরা শোনেনি।'

'কিন্তু, দান্তেকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তো তুমি প্রতিবাদ করোনি।'

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠতে শুরু করলো সরাইওয়ালার ভুরুতে, কপালে।

'আমি সাহস পাইনি, স্যার,' কম্পিত কণ্ঠে বললো সে। 'ওরা দু'জন ভয় দেখিয়েছিলো আমাকে, কিছু বললে খুন করে ফেলবে। সব ভয়, শঙ্কা দূরে ছুঁড়ে ফেলে কেন যে সেদিন প্রতিবাদ করিনি, উহ! আজও মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয় সেজন্যে। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি।'

বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে কাদেরুশের মাথা; যেন ভয়ানক লজ্জায় মাথা উঁচু রাখতে পারছে না। নীরবতা নেমে এসেছে কামরায়।

'দাঁগলারের অবস্থা এখন কেমন?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন পাদ্রী।

'কেমন? স্পেনের সাথে যুদ্ধের সময় ভালো মালকড়ি কামিয়েছে। এখন সে ব্যাঙ্কার। অনেকের ধারণা, ও এখন কোটিপতি। ক'দিন আগে নাকি ব্যারন হয়েছে!'

'আচ্ছা! আর ফার্নান্দের অবস্থা?'

'ওর অবস্থাও বেশ ভালো,' বললো কাদেরুশে। 'স্পেনীয় যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। যুদ্ধে বেশ সাহসের পরিচয় দেয়ায় প্রথমে লেফটেন্যান্ট পরে কর্নেল করা হয় ওকে। যুদ্ধ শেষে বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে সেনাবাহিনীর ক্রস আর কাউন্ট উপাধি পেয়েছে।'

'এ-ও সম্ভব!' মৃদু স্বরে বললেন পাদ্রী। 'আর মার্সিডিস? ওরও কি কপাল খুলেছে?'

'স্যার, ও এখন প্যারিসের সবচেয়ে নামকরা ভদ্রমহিলাদের একজন। মার্সিডিস এখন মাদাম দ্য মরশার্ফ। কাউণ্ট দ্য মরশার্ফ মানে ফার্নান্দকে বিয়ে করেছে ও।'

শুকনো হাসি হাসলেন পাদ্রী।

'দান্তেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর কতদিন অপেক্ষা করেছিলো মার্সিডিস?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আঠারো মাস। তারপর ওরা বিয়ে করে এবং মার্সেই ছেড়ে চলে যায়। আর কখনো ফিরে আসেনি। যতদূর জানি ওদের একটা ছেলে হয়েছে।'

চমকে উঠলেন পাদ্রী। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাদেরুশে বলে চললো, 'সব ক'জনের ভেতর আমিই সবচেয়ে হতভাগ্য। যা ছিলাম তারচেয়ে খারাপ হয়েছে অবস্থা। বন্ধুরা সবাই ভুলে গেছে আমাকে।'

হীরকের ছোট বাক্সটা বাড়িয়ে দিলেন পাদ্রী। 'নাও। এটা এখন তোমার।'

'আমার!' চিৎকার করে উঠলো কাদেরুশে। 'একা আমার! স্যার, আপনি নিশ্চয়ই রহস্য করছেন!'

'দান্তে আমাকে বলে গেছে, ওর বন্ধুদের ভেতর যেন ভাগ করে দেই এটা। দেখছি, তেমন লোক একজনই আছে। নাও এটা। বিক্রি করে যা পাবে, সব তোমার।'

এক হাতে বাক্সটা নিলো কাদেরুশে—পাদ্রী লক্ষ করলেন, হাতটা কাঁপছে, অন্য হাতে কপালের ঘাম মুছলো সে। বললো, 'কী বলবো, স্যার, বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই ঈশ্বর পাঠিয়েছেন আপনাকে!'

শীতল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত পাদ্রী। তারপর আর কিছু না বলে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন সরাইখানা থেকে। শত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে জানাতে পেছন পেছন এলো সরাইওয়ালা। ঘোড়ায় চড়ে বসলেন অ্যাবি বুসোয়াঁ। ছুটিয়ে দিলেন যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে। একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না।

সরাইখানার দৃষ্টির আড়ালে এসে ঘোড়া থামালেন পাদ্রী। পাদ্রীর পোশাক খুলে বেরিয়ে এলো জনৈক এডমণ্ড দান্তে। শিগগিরই সে আবার হাজির হবে লোক সমাজে। এডমণ্ড দান্তে নয়, কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো হিসেবে।

দুই

মে একুশ, উনিশশো আটত্রিশ।

এডমণ্ড দান্তে শ্যাতো দ্'ইফ থেকে পালানোর ন'বছর পর প্রথমবারের মতো প্যারিসে এলেন কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো। অবশ্য আসার অনেক আগে থেকেই তাঁর সম্পর্কে নানা রকম চমকপ্রদ গল্প কাহিনি ছড়িয়ে গেছে নগরীর এক শ্রেণীর মানুষের ভেতর। তাঁর অগাধ ধন সম্পদের কথা, তাঁর অপূর্ব সুন্দর ইয়টের কথা, চমৎকার সব আরবী ঘোড়ার কথা, তলোয়ার ও পিস্তলে তাঁর অদ্ভুত দক্ষতার কথা। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য যে কাহিনি, প্রাচ্যের কোনও এক বন্দর থেকে কেনা সেই সুন্দরী তরুণী, যাকে কাউন্ট কিনেছিলেন দাসী হিসেবে কিন্তু রেখেছেন অপারস্নেহে—তার কথা প্রায়ই আলোচনা করে শহরের অভিজাত নারী পুরুষেরা।

প্যারিসের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন কাউন্ট দ্য মরশার্ফ। তাঁর ছেলে তরুণ আলবার্ট দ্য মরশার্ফ প্রথম ছড়ায় কাহিনীগুলো। গত বছর কার্নিভ্যালের সময় রোমে গিয়েছিলো আলবার্ট; এবং কী কপাল, যে হোটেলে সে উঠেছিলো সেই একই হোটেলে উঠেছিলেন কাউন্টও। কাউন্টের সাথে আলাপ হয় ওর। এই আলাপ শেষ পর্যায়ে বন্ধুত্বে গড়ায়। কী করে কাউন্ট এক রোমান দস্যুদলের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করেছিলেন সুযোগ পেলে এখনও মহাউৎসাহে সেই গল্প করে আলবার্ট।

'রোমের বাইরে এক গ্রামে গিয়েছিলাম কী কাজে যেন,' প্রতিবার এই এক কথা দিয়ে শুরু করে আলবার্ট। 'ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি একা ঘোড়ায় চড়ে ফিরছি। এই সময় চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলো আমাকে মুখে কাপড় বাঁধা, কালো পোশাক পরা দস্যুরা। পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেল ওদের আস্তানায়; মুক্তিপণ হিসেবে চার হাজার ক্রাউন না পেলে ছাড়বে না। এদিকে আমি যা টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম প্রায় সব খরচ হয়ে গেছে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে ঠিক করলাম কাউন্টের কাছেই সাহায্য চাইবো। একটা চিঠি লিখে ডাকাতদের একজনের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম হোটেলে। তারপর যা ঘটলো সে রীতিমতো অবিশ্বাস্য ঘটনা। কাউন্ট এলেন ডাকাতদের আস্তানায়। একা! দস্যু সর্দার লুইগি ভ্যামপার সাথে মাত্র আধ মিনিট কথা বললেন তিনি। ব্যস আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম! পরে কাউন্ট আমাকে বলেছিলেন, এই লুইগি ভ্যামপা নাকি আগে চোরাচালান করে বেড়াতো, কাউন্ট একবার তাকে ডুবে মরা

থেকে বাঁচিয়েছিলেন। যা হোক, সব দেখে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, আমাকে ছেড়ে দেয়া তো তুচ্ছ, কাউন্টের জন্যে যে কোনও কিছু করতে পারে ওরা!'

কাহিনিটা অদ্ভুত, কিন্তু আরো অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগলো কাউন্ট আসার পর। যেমন, প্রথম যেদিন তাঁকে বাসায় নিয়ে গিয়ে বাবা মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো আলবার্ট, সেদিন কাউন্টকে দেখামাত্র ওর মা মাদাম দ্য মরশার্ফ—যাঁর খ্রীষ্টীয় নাম মার্সিডিস—কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিলেন, মুখটা হয়ে গিয়েছিলো মরা মানুষের মতো রক্তশূন্য। 'কাউন্ট যেন ভূত বা রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার,' পরে মন্তব্য করেছে আলবার্ট।

সত্যি কথা বলতে কী ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই কাউন্টের চেহারার। অসম্ভব সুপুরুষ, লম্বাটে মুখ, সবচেয়ে যেটা চমকে দেয় মানুষকে তাহলো, মুখের ফ্যাকাসে রং, যেন কয়েক যুগ আটকে ছিলো অন্ধকার সমাধিতে; দাঁতগুলো সরু সরু, ছুঁচালো, আর খুব সাদা। এই চেহারা যদি কারো মনে শিরশিরানি অনুভূতি জাগায় তো তাকে দোষ দেয়া যায় না।

কাউন্ট দ্য মরশার্ফ অবশ্য ছেলের অতিথির চেহারায় অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পাননি। কাউন্ট যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ দিব্যি গল্প করেছেন। এক পর্যায়ে মার্সেইয়ে তাঁর জীবনের সূচনা পর্বের কথাও বলেছেন। সেসময় তাঁর নাম ছিলো ফার্নান্দ মনডেগো তা-ও বলতে সংকোচ করেননি।

কাউন্ট প্রথম যেদিন প্যারিসে এলেন সেদিনই আরেকজনের মুখ অমন মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কাউন্টের কথা শুনে কেঁপে উঠলো তার শরীর। লোকটার নাম মঁসিয়ে বার্তুচ্চিও। কর্সিকান। কাউন্টের খাস ভৃত্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে ক'দিন আগে।

প্যারিসে আসার আগেই প্রতিনিধি মারফত একটা বাড়ি কিনেছেন কাউন্ট। শঁজেলিজে এলাকায়! প্যারিসে এসে ওই বাড়িতেই উঠেছেন তিনি, সেদিন বিকেলে যখন একান্ত ভৃত্যকে ডেকে পাঠালেন কাউন্ট তখনই ঘটলো ঘটনাটা।

'বার্তুচ্চিও,' কাউন্ট বললেন, 'আমি আরেকটা বাড়ি কিনেছি। সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেখে কিনে ফেলেছি। শুনেছি বাড়িটা নাকি খুব ভালো জায়গায়, নিজে গিয়ে একটু দেখে শুনে আসতে চাই। তুমিও যাবে আমার সাথে। সিটি গেট-এর কাছে অতেইল-এ...'

শব্দটা শোনামাত্র রক্তশূন্য হয়ে গেল বার্তুচ্চিওর মুখ।

'অতেইল-এ, মঁসিয়ে!' অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে সে বললো। 'আমি অতেইল-এ যাবো!'

'কেন নয়?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করলেন কাউন্ট।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মুখটা ঝুলে পড়লো বার্তুচ্চিওর। কোনও জবাব দিতে পারলো না সে।

'আমার গাড়ি আনতে বলো,' নির্দেশ দিলেন কাউন্ট। 'এখনই রওনা হবো আমরা।'

স্খলিত পায়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল বার্তুচ্চিও। কোচোয়ানকে যখন গাড়ি নিয়ে আসতে বললো তখন কেন জানি না কেঁপে গেল ওর গলা।

যাওয়ার পথে গাড়ির এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে রইলো বার্তুচ্চিও। অসুস্থ উদ্বেগে ঘন ঘন তাকাচ্ছে জানালা দিয়ে পথের পাশের বাড়িগুলোর দিকে।

তীক্ষ্ণ চোখে কাউন্ট নিরীক্ষণ করছেন একান্ত-ভৃত্যের মুখ। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'রু দ্য লা ফঁতেন-এর ২৮ নম্বর বাড়ির সামনে থামতে বলো।'

ঘামে ভিজে গেছে বার্তুচ্চিওর কপাল। কাউন্ট খেয়াল করলেন, এবার হাত দুটোও কাঁপতে শুরু করেছে ওর। একটা ঢোক গিলে নির্দেশটা বার্তুচ্চিও জানিয়ে দিলো কোচোয়ানকে।

একটু পরেই দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়ি। ভৃত্যকে নিয়ে নেমে এলেন কাউন্ট।

বাড়িটা লম্বাটে চেহারার। নিচু। অন্ধকার। বোঝা যাচ্ছে, কেউ নেই এখন ভেতরে। কাউন্ট বললেন, 'গাড়ি থেকে একটা লণ্ঠন নিয়ে এসো, বার্তুচ্চিও। ঘরগুলো আমি দেখতে চাই। এই নাও চাবি।'

নিঃশব্দে নির্দেশ পালন করলো বার্তুচ্চিও। তবে ওর হাত কাঁপা আর মুখের ভীত ভাব দেখে কাউন্টের বুঝতে অসুবিধা হলো না এমন শান্ত থাকার জন্যে ভেতরে ভেতরে কী ভীষণ প্রয়াস চালাতে হচ্ছে তাকে।

বিশাল একতলাটা দেখলেন ওঁরা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন দোতলায়। একে একে দেখতে লাগলেন শোয়ার ঘরগুলো। একটা ঘরের ভেতর দিয়ে সরু পেঁচানো একটা সিঁড়ির কাছে এলেন। বাগানে নেমে গেছে সিঁড়িটা।

'চলো নিচে গিয়ে বাগানটা একটু দেখি,' বললেন কাউন্ট।

চমকে হোঁচট খেতে গিয়ে অতিকষ্টে সামলে নিলো বার্তুচ্চিও। কাউন্টের মুখের দিকে একবার তাকালো। তারপর নিঃশব্দে নামতে শুরু করলো। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

'কী হলো, বার্তুচ্চিও, দাঁড়ালে কেন, এগোও!'

'না, না,' লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে আতঙ্কিত গলায় ফিসফিস করে উঠলো বার্তুচ্চিও। 'আমি আর যেতে পারবো না, মঁসিয়ে। আমাকে মাফ করবেন।'

'এ সবের কী মানে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!' বিরক্তি কাউন্টের কণ্ঠস্বরে।

'কেন এই বাড়িটাই হলো?' হতাশ কণ্ঠে বললো বার্তুচ্চিও। 'উহ, কেন আগেই সব আপনাকে বলিনি? আমি জানি, সব শুনলে আপনি কক্ষনোই আমাকে এই খুনের বাড়িতে নিয়ে আসতেন না।'

তীক্ষ্ণ কৌতূহলী চোখে একান্ত-ভৃত্যের দিকে তাকালেন মন্টিক্রিস্টো। তারপর একটু হেসে বললেন, 'হয়েছে বার্তুচ্চিও, লণ্ঠনটা নাও। এসো আমার সাথে। ভূতের ভয় পাচ্ছো? পাগল!'

নিঃশব্দে লণ্ঠনটা তুলে নিলো বার্তুচ্চিও। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো এগোলো কাউন্টের পেছন পেছন। বিরাট একটা ঘাসে ছাওয়া উঠোন। তারপরই ঝোপ ঝোপ মতো কয়েকটা গাছ। থেমে দাঁড়ালেন মন্টিক্রিস্টো।

'থামলেন কেন, মঁসিয়ে, চলুন!' আতঙ্কে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো বার্তুচ্চিও।

'ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি!'

'ঠিক সেই জায়গায়!'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, যেখানে ও পড়ে গিয়েছিলো। যেখানে ওকে খুন করা হয়েছিলো।'

'কী পাগলের মতো বকছো, বার্তুচ্চিও,' ধমক দিলেন কাউন্ট, 'যতদূর জানি তুমি কর্সিকান, কারাগারে ছিলে। মুক্তির পর আমার বন্ধু অ্যাবি বুসোয়াঁর সুপারিশে তোমাকে চাকরি দিয়েছি। ভেবেছিলাম চুরি ছ্যাঁচড়ামি করে ধরা পড়েছিলে, এখন বলছো খুন খারাবির কথা!'

'চুরি নয়, মঁসিয়ে,' প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললো বার্তুচ্চিও, 'চোরাচালানের অপরাধে, ধরা পড়েছিলাম আমি। যাক সে কথা, চাকরি হওয়ার পর থেকেই খুব ভালো ব্যবহার পেয়ে আসছি আপনার কাছ থেকে; তাই ঠিক করেছি সব বলবো আপনাকে। কিন্তু তার আগে মঁসিয়ে, ওই গাছটার কাছ থেকে সরে আসুন দয়া করে। আপনাকে ওই পোশাকে ওখানে দেখে মঁসিয়ে ভিলফোর্তের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার।'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠলেন মন্টিক্রিস্টো। 'মঁসিয়ে দ্য ভিলফোর্ত!' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ–নিমেস-এ বিচারক ছিলো লোকটা।'

'মার্সেই-এও,' বিড়বিড় করলেন কাউন্ট।

'ওর মতো বদ স্বভাবের মানুষ খুব কমই হয় দুনিয়াতে!'

'কী বলছো তুমি!'

'সত্যি কথাই বলছি, মঁসিয়ে। পুরো ঘটনা শুনলে বুঝতে পারতেন।'

'বলো তাহলে শুনি।' একটা বেঞ্চে বসে পড়লেন কাউন্ট। 'আমার কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছো তুমি...'

তিন

'এক সময় আমার এক ভাই ছিলো,' শুরু করলো বার্তুচ্চিও। 'আমার পাঁচ বছর বয়েসে আমরা এতিম হই। ওর তখন আঠারো। বাবা মারা যাওয়ার পর আমাকে বড় করে তোলার দায়িত্ব নেয় ভাই। নিজের ছেলেকে যেভাবে মানুষ করে তেমনিভাবে ও আমাকে মানুষ করেছে। তারপর একদিন এলবা থেকে ফিরলো নেপোলিয়ন। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে চলে গেল আমার ভাই। বেশ কিছুদিন পর একটা চিঠি পেলাম ওর। লিখেছে, ওদের বাহিনী ভেঙে দেয়া হয়েছে, ও বাড়ি ফিরে আসছে। তারপর অনুরোধ করেছে, আমার কাছে টাকা থাকলে যেন নিমেস-এর এক সরাইওয়ালার কাছে তা রেখে দেই। ওই সরাইওয়ালার সাথে আমার কিছু লেনদেনের সম্পর্ক ছিলো।'

'চোরাচালানের?' জিজ্ঞেস করলেন মন্টিক্রিস্টো।

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে—বাঁচার অধিকার সবারই আছে, আর বাঁচতে হলে কিছু না

কিছু করতেই হয়। যা হোক স্যার, আমি ঠিক করলাম, কারো মারফতে টাকা পাঠাবো না, নিজে নিয়ে যাবো ভাইয়ের কাছে। নিমেসের পথে রওনা হলাম আমি। সেই সরাইখানায় পৌঁছে যা দেখলাম—উহ্ স্যার! কল্পনা করতে পারবেন না! খালি রক্ত, রক্ত আর মৃতদেহ। প্রতি পদক্ষেপেই দেখতে হয়েছে খুনীদের পাশবিকতার চিহ্ন। দক্ষিণ ফ্রান্সে সে সময় যতগুলো কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড ঘটেছিলো তার ভেতর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিলো ওটা। যাকেই বোনাপার্টিস্ট বলে সন্দেহ করেছে নির্বিচারে হত্যা করেছে।

'ভাইয়ের কথা ভেবে ভয় হলো আমার। তাড়াতাড়ি সরাইওয়ালার কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম ওর খবর। সরাইওয়ালা যা বললো সে এক রোমহর্ষক কাহিনী। আগের দিন সন্ধ্যায় নাকি ওই সরাইখানারই দরজায় খুন করা হয়েছে আমার ভাইকে। নিরস্ত্র ছিলো ও, তারপরও খুনীরা পেছন থেকে হামলা চালিয়েছিলো।

'খুনীদের খুঁজে বের করার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম; কিন্তু কেউই মুখ খুলতে সাহস পেলো না। অবশেষে ঠিক করলাম, বিচার বিভাগের সাহায্য নেবো। মঁসিয়ে দ্য ভিলফোর্ত তখন নিমেস জেলার প্রধান বিচারপতি। গেলাম তার কাছে। কী নৃশংস ভাবে আমার নিরপরাধ ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, বললাম। "অপরাধী কে বা কারা আমি জানি না," সবশেষে যোগ করলাম, "তবে আপনার দায়িত্ব তাদের খুঁজে বের করা।"

' "আমি কী করতে পারি?" তাচ্ছিল্যের সাথে জিজ্ঞেস করলো মঁসিয়ে দ্য ভিলফোর্ত।

' "তা তো আগেই বলেছি। খুঁজে বের করে আটক করবেন।"

' "কাকে?"

' "আমার ভাইকে যারা নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে।"

' "কারা তোমার ভাইকে হত্যা করেছে, আমি কী করে জানবো?"

' "আপনি নির্দেশ দিলেই রক্ষীরা খুঁজে বের করে ফেলবে।"

'আমার মুখের ওপর হেসে উঠলো মঁসিয়ে দ্য ভিলফোর্ত। "দেখ ছোকরা,' বললো সে, "একটা বিপ্লব হয়ে গেল ক'দিন আগে। তোমার ভাই এই বিপ্লবেরই একজন বলি। এমন আরো কত লোক খুন হয়েছে। তাছাড়া বোনাপার্টিস্ট-এর সংখ্যা যত কমে ততই মঙ্গল। যাকগে, তোমরা কর্সিকানরা সব পাগল। এখন ভাগো এখান থেকে, আমার সময়ের দাম আছে!"

'আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম এ কথা শুনে। নড়ার শক্তিও যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। এই সময় আবার চিৎকার করে উঠলো ভিলফোর্ত, "যাবে, না ভাইয়ের পরিণতি হোক তোমারও তাই চাও?"

'বিচারকের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, করুণার কোনও চিহ্ন সেখানে নেই। তখন ধীরে ধীরে আমি এগিয়ে গেলাম তার কাছে। নিচু কণ্ঠে বললাম, "কর্সিকানদের যখন এতই ভালো চেনো, নিশ্চয়ই জানো ওরা কথা দিলে প্রাণ দিয়ে হলেও তা রক্ষা করে। তুমি রয়্যালিস্ট, তাই তোমার ধারণা আমার ভাইকে যারা হত্যা করেছে তারা ভালো কাজ করেছে; বেশ, তাহলে আমার ধারণা

তুমিও হত্যাকারীদের একজন। এখানে দাঁড়িয়ে আমি শপথ করছি, তোমাকে হত্যা করবো। আমার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেবো। আজ থেকে আমিও বোনাপার্টিস্ট হয়ে গেলাম। এর পরের বার যখন আমাদের সাক্ষাৎ হবে, বুঝবে তোমার সময় শেষ!"

'আমার কথা শুনে ভয়ে, বিস্ময়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলো লোকটা। তার সংবিৎ ফেরার আগেই আমি বেরিয়ে এসেছিলাম তার ঘর ছেড়ে।'

'আচ্ছা!' বললেন মন্টিক্রিস্টো। 'কর্সিকানদের কাছে প্রতিশোধ শব্দটার অর্থ কি তা ও জানতো?'

'খুব ভালো করে জানতো। কারণ সেদিনের পর কখনো একা রাস্তায় বেরোয়নি ভিলফোর্ত। আমাকে ধরার জন্যে পুলিস লেলিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু সময় থাকতেই আমি লুকিয়ে পড়েছিলাম। খুব সাবধানে চলাফেরা করতাম।

'কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পরও যখন পুলিস আমাকে ধরতে পারলো না, তখন সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে গেল ভিলফোর্ত। সরকারের কাছে দেন দরবার করে ভার্সেই-এ বদলী হয়ে গেল। কিন্তু, স্যার, জানেন তো প্রতিশোধ নেবে বলে যে কর্সিকান শপথ করেছে তার কাছে দূরত্ব কোনও বাধাই নয়। লোকটা ভার্সেই-এ পৌঁছার ঠিক আধদিনের মাথায় পায়ে হেঁটে আমিও পৌঁছে গেলাম ওখানে।

'তিন মাস আমি ছায়ার মতো লেগে রইলাম ওর পেছনে। অবশেষে আবিষ্কার করলাম রহস্যময় কোনও কারণে সে অতেইল-এর এক বাড়িতে যায়। ওকে অনুসরণ করে এখানে এসে পৌঁছুলাম। রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ওই যে, ওই ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। আশপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, বিধবা এক যুবতী ভাড়া থাকে এ বাড়িতে। মহিলার আসল নাম কেউ বলতে পারলো না, "ব্যারনেস" বলেই সে পরিচিত সবার কাছে।

'পরপর বেশ কয়েকদিন বাড়িটাকে পর্যবেক্ষণ করলাম আমি। ভিলফোর্ত কখন আসে-যায় খেয়াল করলাম। তারপর একদিন সন্ধ্যায় লুকিয়ে রইলাম ওপাশের দেয়ালের আড়ালে। মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখছি, সুন্দরী এক মহিলা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে। সন্ধ্যা যে হয়ে গেছে সে খেয়াল নেই। একটু পরেই ভিলফোর্ত এলো। মেয়েটা ছুটে এলো ওকে দেখে। হেসে কী যেন বললো। তারপর বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল দু'জনে। আমার কোনও সন্দেহ রইলো না, একে অপরের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ওরা।

'বুঝতে পারলাম, সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমার ছুরিটা খুলে নিলাম খাপ থেকে। হাত দিয়ে অনুভব করে দেখলাম, আগাটা যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। আর দেরি না করে পাঁচিল টপকে বাগানের ভেতর চলে এলাম আমি। ওই যে, ওখানে, ওই ঝোপটার ভেতর অপেক্ষা করতে লাগলাম ভিলফোর্তের জন্যে।

'কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। বাড়ির ভেতরে ঘড়িতে বারোটা বাজার ঘণ্টা পড়লো। ঘণ্টার শেষ শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার কয়েক মুহূর্ত পরে আলো দেখতে পেলাম পাশের একটা দরজায়। ভিলফোর্ত বেরিয়ে এলো। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আলো মিলিয়ে গেল।

'সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে ভিলফোর্ত। চুপ করে বসে রইলাম আমি। হাতে ছুরি তৈরি। আমার একেবারে কাছে এসে পড়লো ও। আচমকা লাফিয়ে উঠেই ছুরিটা বসিয়ে দিলাম ওর বুকে। আর্তনাদ করারও সুযোগ পেলে না ভিলফোর্ত, পড়ে গেল। পাঁচিল টপকে ছুটলাম আমি। কয়েক মিনিটের ভেতর পৌঁছে গেলাম ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে।

'সপ্তা দুয়েক পরে কর্সিকায় ফিরে গেলাম আমি। নিষ্ঠার সঙ্গে আবার চোরাচালান শুরু করলাম। ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই কাটিয়েছি।' কাহিনি শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো বার্তুচ্চিও। তারপর বললো, 'সব তো শুনলেন, স্যার কাউন্ট; আমি খুনী, এখন ইচ্ছে হলে আমাকে রাখবেন, না হলে বিদায় করে দেবেন!'

ক্ষণিকের জন্যে নীরবতা নেমে এলো সেখানে। তারপর মৃদু কণ্ঠে কাউন্ট বললেন:

'না, বার্তুচ্চিও, তুমি ভুল ভেবে এসেছো এতদিন। মঁসিয়ে ভিলফোর্তকে তুমি হত্যা করতে পারোনি—সামান্য আহত করেছিলে শুধু।' এখনও বেঁচে আছে সে, এবং এই প্যারিসেই আছে। ফাউবুর্গ সেইন্ট-অনরিতে বিশাল এক অট্টালিকার মালিক এখন সে। সুখ্যাতিও প্রচুর—একশো বছরের মধ্যে নাকি অমন কড়া বিচারক আর জন্মায়নি ফ্রান্সে। নিন্দুকেরা অবশ্য বলে, মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ উপভোগ করে ও।'

দু'চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে বার্তুচ্চিও। 'তা কী করে সম্ভব? আমি ওকে হত্যা করতে পারিনি!'

এপাশ ওপাশ মাথা দোলালেন কাউন্ট। রাগে কাঁপতে শুরু করেছে বার্তুচ্চিও।

'আমি শপথ করেছিলাম,' ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললো ও, 'ভিলফোর্ত আমার হাতে মরবে। প্রতিশোধ আমাকে নিতেই...'

হঠাৎ থেমে গেল বার্তুচ্চিও। কাউন্টের দিকে তাকালো। তারপর মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, 'স্যার, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি—আমি ঠিক—।'

'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, বার্তুচ্চিও,' সহানুভূতির সঙ্গে বললেন কাউন্ট। 'কয়েকটা দিন ছুটি নাও, ভালো বোধ করবে।'

'স্যার!'

'হ্যাঁ, আগামী তিনদিন তোমার কোনও কাজ করতে হবে না। ঘুরে বেড়াও। দেখার মতো, করার মতো অনেক কিছু আছে প্যারিসে, তাই না? টাকা পয়সা লাগলে...?'

'না, না, মঁসিয়ে,' তাড়াতাড়ি বললো বার্তুচ্চিও, 'বেতন হিসেবে আপনি আমাকে যা দেন তা যথেষ্ট।'

'তাহলে যাও, গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াও, আমি আসছি।'

দুর্বোধ্য একটা চাউনি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল কাউন্টের চোখে।

'তিনদিন অনুপস্থিত রইলো বার্তুচ্চিও। কাউন্টের ভৃত্য, কর্মচারীদের কেউ ওর

চেহারা দেখেনি এ তিনদিন। কোথায় গিয়েছিলো, কী করেছে তা-ও জানে না কেউ।'

তৃতীয় দিন সকালে প্যারিসের সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে একটা খবর ছাপা হলো:

গত রাতে স্বনামখ্যাত বিচারক মঁসিয়ে দ্য ভিলফোর্ত আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। রাতের খাওয়ার পর যখন মহামান্য বিচারক তাঁর বাড়ির পেছনের বাগানে হাঁটছিলেন তখন কে বা কারা যেন তাঁর হৃৎপিণ্ড বরাবর তীক্ষ্ণধার একটি ছুরি আমূল বিঁধিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। হত্যাকারী কোনও সূত্র ফেলে যায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, মৃতদেহের বুকে পিন দিয়ে আঁটা এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেছে। তাতে লেখা:

'এবার আর কোনও ভুল হয়নি। আমার ভাইয়ের হত্যার বদলা আমি নিয়েছি। আমার প্রতিশোধের শপথ আজ পূর্ণ হলো।'

অদ্ভুত কথাগুলোর মাথামুণ্ড কেউ কিছু বুঝতে পারলো না। বিচারকের হত্যা রহস্যও অনুদঘাটিত রয়ে গেল। খুনীর সন্ধান করতে পারলো না পুলিস।

একই দিন দুপুরের কিছু আগে কাউন্টের বাড়িতে ফিরে এলো বার্তুচ্চিও। একটু বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে বটে তবে ওর চোখ দুটোয় আশ্চর্য এক প্রশান্তি।

ওকে দেখেই সাদর আহ্বান জানালেন কাউন্ট, 'তুমি এসেছো, বার্তুচ্চিও! এখন অনেক ভালো বোধ করছো না?'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলো বার্তুচ্চিও, 'অনেক ভালো বোধ করছি। সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে।'

'শুনে খুব খুশি লাগছে। যাও তাহলে কাজে লেগে পড়ো আবার।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল বার্তুচ্চিও। হাঁটুর ওপর মেলে রাখা খবরের কাগজটার দিকে তাকালেন কাউন্ট।

'এক,' রহস্যময় স্বরে উচ্চারণ করলেন তিনি।

চার

'কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, মঁসিয়ে,' ঘোষণা করলো কেরানী।

ডেস্কে ঝুঁকে কাজ করছিলেন ব্যাঙ্ক, হাউস অভ দাঁগলার-এর স্বত্বাধিকারী ব্যারন দাঁগলার। মুখ তুলে তাকালেন। বিরক্তির কুঞ্চন পড়লো মুখে।

'নিয়ে এসো,' আদেশ করলেন তিনি।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই দাঁগলারের দপ্তরকক্ষে ঢুকলেন ছিপছিপে চেহারার দীর্ঘদেহী কাউন্ট। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সামান্য মাথা ঝাঁকালেন ব্যারন দাঁগলার। হাতের ইশারায় একটা হাতলওয়ালা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। বসলেন কাউন্ট।

'মঁসিয়ে কাউন্ট, রোমের ব্যাঙ্কার থমসন অ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ-এর কাছ থেকে একটা

পরামর্শ পত্র পেয়েছি আমি,' বললেন ব্যারন।

'শুনে খুশি হলাম,' সহজ কণ্ঠে বললেন কাউন্ট। 'এ মুহূর্তে টাকার খুব দরকার আমার।'

'কিন্তু ওই চিঠির একটা কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ভুরু দুটো সামান্য উঁচু হলো কাউন্টের। 'বলুন শুনি, কী বুঝতে পারছেন না।'

'এই চিঠিতে কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টোকে অনির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ধার দিতে বলা হয়েছে।'

'এর ভেতর না বোঝার মতো কী আপনি পেলেন, জানতে পারি?'

'এই "অনির্দিষ্ট অঙ্ক" কথাটাই আমি বুঝতে পারছি না।'

বিস্মিত দেখালো কাউন্টের চেহারা।

'শব্দটা কি ফ্রান্সে প্রচলিত নয়?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'নাকি থমসন অ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ-এর কথায় আপনি ভরসা করতে পারছেন না?'

'থমসন অ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ-এর ওপর আমাদের পুরোপুরি আস্থা আছে, মঁসিয়ে কাউণ্ট,' অতি কষ্টে একটু হেসে জবাব দিলেন দাঁগলার। 'ওদের সুনাম সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন আমি তুলছি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে অনির্দিষ্ট অঙ্ক কথাটার...'

'বুঝতে পেরেছি,' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মন্টিক্রিস্টো, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন, কারণ আপনার ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।'

ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ব্যাঙ্ক মালিক।

'মঁসিয়ে! আমার মূলধন সম্পর্কে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেনি। আপনি বলুন, কত টাকা চাই আপনার!'

'সত্যি কথা বলতে কী, অনির্দিষ্ট অঙ্কের টাকাই আমার দরকার। ঠিক কত টাকা তা আমারও জানা নেই।'

হতাশ ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে বসে পড়লেন ব্যারন দাঁগলার। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গর্বিত কণ্ঠে বললেন, 'যে কোনও অঙ্কের টাকার চাহিদা যে কোনও সময় পূরণ করতে পারে আমার ব্যাঙ্ক। কত চাই আপনার? এক মিলিয়ন...?'

'মাফ করবেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না,' অবাক কণ্ঠে বললেন কাউন্ট মন্টিক্রিস্টো।

আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন দাঁগলার। বললেন, 'বলছি, আপনি চাইলে আমার ব্যাঙ্ক আপনাকে এক মিলিয়ন ফ্রাঁ ধার দেবে।'

'এক মিলিয়ন? এই সামান্য টাকা দিয়ে আমি কী করবো? এক মিলিয়ন। মাফ করবেন, আপনি যে অঙ্কের কথা বলছেন তা সবসময় আমার পকেটেই থাকে।'

বলতে বলতে পকেট থেকে ছোট্ট একটা চ্যাপ্টা বাক্স বের করলেন কাউন্ট। তার ভেতর থেকে বের হলো সরকারি খাজাঞ্চিখানার দুটো নির্দেশপত্র। অর্থাৎ কাগজের টাকা, প্রত্যেকটার ওপর লেখা, 'সরকারি খাজাঞ্চিখানা চাহিবামাত্র ইহার বাহককে পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ দিতে বাধ্য থাকিবে।'

মুহূর্তে নিভে গেল দাঁগলারের আত্মপ্রসাদ। কেমন যেন হতভম্ব দেখাচ্ছে তাঁকে।

'কী হলো, ঘাবড়ে গেলেন নাকি?' বললেন মন্টিক্রিস্টো। 'তাহলে পারছেন না আপনি আমাকে টাকা দিতে? অন্য ব্যাঙ্কে যাবো?'

জায়গামতো লাগলো আঘাতটা। উঠে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন দাঁগলার, এবার সত্যি বিনীতভাবে। বললেন, 'ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে, লোক চিনতে একটু ভুল করে ফেলেছিলাম। যাক, কত দরকার আপনার?'

'কত? আঁ..., আপাতত ছয় মিলিয়ন—।'

'ছয় মিলিয়ন!' ঢোক গিললেন ব্যারন দাঁগলার। কাউন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বুঝে নেয়ার চেষ্টা করলেন ঠাট্টা করছেন কিনা। না, তেমন কোনও চিহ্নই নেই কাউন্টের মুখে। তখন বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আপনার যা ইচ্ছা!'

'যদি আরো লাগে,' আপন মনে বললেন কাউন্ট, 'আপনার কাছ থেকেই নেবো, কী বলেন? দেখা যাক লাগে কি না।'

'কাল সকাল দশটার ভেতর আপনার বাড়িতে টাকা পৌঁছে যাবে,' বললেন ব্যাঙ্ক-মালিক। 'কীসে নেবেন? সোনায়, রূপায় না নোটে?'

'আপনার যদি অসুবিধা না হয় অর্ধেক নোটে, বাকি অর্ধেক সোনায়।' উঠে দাঁড়ালেন কাউন্ট।

'স্বীকার করছি, মঁসিয়ে,' বললেন ব্যারন, 'আমি ধারণা করতে পারছি না, আপনার ধন-সম্পদের পরিমাণ ঠিক কত!'

'দুশ্চিন্তা করবেন না, শিগগিরই জেনে যাবেন।'

অদ্ভুত রহস্যময় এক হাসি হাসলেন কাউন্ট। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এলেন হাউস অভ দাঁগলার থেকে।

'আরে, এ যে দেখছি মন্টিক্রিস্টো স্বয়ং!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলো আলবার্ট দ্য মরশার্ফ। 'সুন্দরী ক্রীতদাসীও আছে সঙ্গে!'

সেদিনই রাতে বাবা-মায়ের সাথে অপেরা দেখতে এসেছে আলবার্ট। তিনজনেরই, এবং সত্যি কথা বলতে কী বেশিরভাগ দর্শকেরই দৃষ্টি প্রথম সারির একটি বক্সের দিকে। এইমাত্র সেটায় ঢুকে আসন গ্রহণ করেছেন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক এক দীর্ঘদেহী পুরুষ আর এক অপরূপা তন্বী তরুণী। গাঢ় কালো রঙের পোশাক ভদ্রলোকের গায়ে, তরুণী সাজসজ্জা করেছে প্রাচ্য দেশীয় ঢং-এ।

'আমি ভেবেছিলাম কাউন্ট বুঝি অবিবাহিত,' বললেন মঁসিয়ে দ্য মরশার্ফ। ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছেন তিনি তরুণীর দিকে।

'তা-ই তো,' জবাব দিলো আলবার্ট। 'মেয়েটা ওর স্ত্রী নয়, ক্রীতদাসী।'

মাদাম দ্য মরশার্ফ এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন কাউন্টের দিকে। এবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'উহ! কী ভয়ঙ্কর ফ্যাকাসে লোকটার মুখ!'

আর এগোলো না আলাপ। পর্দা উঠছে মঞ্চের। প্রথম দৃশ্য শুরু হবে

এখুনি।

শেষ হলো প্রথম দৃশ্য। ছেলের বাহুতে হাত রাখলেন মাদাম মরশার্ফ। বললেন, 'আলবার্ট, যাও তোমার কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টোকে নিয়ে এসো আমাদের কাছে। আরেকবার আলাপ করতে ইচ্ছে করছে ভদ্রলোকের সাথে।'

'যাচ্ছি। আমি বললে নিশ্চয়ই আসবেন কাউন্ট। ওই দেখ, মা, তোমার দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়াচ্ছেন উনি!'

মাদাম মরশার্ফও মাথা নোয়ালেন কাউন্টের দিকে তাকিয়ে। সঙ্গিনীর দিকে ঘুরে কী যেন বললেন কাউন্ট। তারপর উঠে বেরিয়ে এলেন বক্স থেকে। মিনিটখানেকের ভেতর মরশার্ফদের বক্সে এসে ঢুকলেন তিনি। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন সবাইকে। মাদাম মরশার্ফের সুন্দর হাতটা তুলে নিয়ে আলতো করে ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। প্রথমদিনের মতো অতটা না হলেও আজও একটু ফ্যাকাসে হলেন মাদাম মরশার্ফ। অবশ্য দ্রুত সামলে নিয়ে জবাব দিলেন কাউন্টের অভিবাদনের।

'আসুন! আসুন!' দরাজ কণ্ঠে বলে উঠলেন কাউন্ট মরশার্ফ। 'আমার ছেলেকে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তা আমি ভুলিনি। আপনার সুন্দরী সঙ্গিনীকে নিয়ে এলেই পারতেন।'

'না; বেচারি খুব দুঃখী; গ্রীক, আপনাদের মাঝে এসে হয়তো বিব্রত বোধ করতো,' মৃদুকণ্ঠে বললেন মণ্টিক্রিস্টো।

'নাম কী ওর?'

'হেইডি,' জবাব দিলেন কাউন্ট।

কেন যেন ভ্রূদুটো কুঁচকে গেল কাউন্ট দ্য মরশার্ফের।

'গ্রীক?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' বললেন মণ্টিক্রিস্টো। 'শুনেছি, মঁসিয়ে কাউন্ট, আপনি নাকি কিছুদিন গ্রীসে কাজ করেছেন।'

'সে বহুদিন আগের কথা,' একটু রুক্ষস্বরে জবাব দিলেন মরশার্ফ। 'গ্রীসে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে যে পুরস্কার পেয়েছিলাম তার দৌলতেই আমার আজকের প্রতিষ্ঠা।'

'কিন্তু ওকী!' হঠাৎ বলে উঠলেন মণ্টিক্রিস্টো।

'কী! কোথায়?' জানতে চাইলেন মরশার্ফ।

'ওই যে ওখানে,' হাত তুলে ইশারা করেই সামনের দিকে ছুটে গেলেন মণ্টিক্রিস্টো। প্রথম সারিতে নিজের বক্সের দিকে তার দৃষ্টি।

কাউন্ট চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলো হেইডি। তারপরই একা একা লাগতে লাগলো ওর। কাউন্ট কোথায় গেলেন দেখার জন্যে উঠে দাঁড়ালো ও। এদিক-ওদিক তাকালো। পেছন দিকের একটা বক্সে দেখতে পেলো কাউন্টের ফ্যাকাসে মুখটা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো হেইডি। এমন সময় হঠাৎ কাউন্টের পাশে দাঁড়ানো কাউন্ট মরশার্ফের ওপর চোখ পড়লো ওর।

অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটলো এরপর। ভয়ঙ্কর কিছু একটা দেখেছে এমন ভঙ্গিতে চোখ দুটো বড় হয়ে গেল হেইডির। অস্পষ্ট একটা চিৎকার করে ধপাস

করে বসে পড়লো চেয়ারে। ঠিক সেই সময় কাউন্ট অভ মণ্টিক্রিস্টো তাকিয়েছিলেন ওর দিকে।

'ওই যে ওখানে,' কাউন্ট মরশার্ফের প্রশ্নের জবাবে হাত তুলে ইশারা করলেন মণ্টিক্রিস্টো। তারপর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে দরজার দিকে এগোলেন।

'হেইডি বোধহয় অসুস্থ বোধ করছে,' বললেন তিনি। 'আমি চললাম, আপনারা অনুগ্রহ করে কিছু মনে করবেন না।'

দরজার কাছে গিয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন মণ্টিক্রিস্টো। তারপর বেরিয়ে গেলেন বক্স থেকে।

নিজের বক্সে ফিরে কাউন্ট দেখলেন ফ্যাকাসে মুখে বসে আছে হেইডি। কাঁপছে থরথর করে। কাউন্টকে দেখেই ও আঁকড়ে ধরলো তাঁর হাত।

'কী হয়েছে, হেইডি,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন কাউন্ট, 'এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? কাঁপছো কেন?'

'কার সাথে কথা বলছিলে?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো হেইডি, কাঁপছে ওর গলা।

'কাউন্ট দ্য মরশার্ফের সাথে। কেন?'

'লোকটা বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ,' বললো হেইডি।

'তাই নাকি! কিন্তু ও তো বলছিলো গ্রীসে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে পুরস্কার পেয়েছিলো, এবং সে কারণেই নাকি আজ ওর এই প্রতিষ্ঠা।'

'মিথ্যেবাদী, কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক! ও আমার বাবাকে তুর্কীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো। আর যে প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার ও করছে তা কী থেকে এসেছিলো জানো? নিছক বিশ্বাসঘাতকতা।'

'হুঁ!' চিন্তিত স্বরে বললেন মণ্টিক্রিস্টো। 'এধরনের একটা গল্প গ্রীসে থাকতে শুনেছিলাম বটে। চলো, পুরো ঘটনাটা বলবে আমাকে।'

'হ্যাঁ, চলো! আর একমুহূর্ত এখানে থাকতে পারবো না। এত কাছে বসে আছে ও ভাবতেই দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার!'

উঠে দাঁড়ালো হেইডি। কাউন্টের হাত ধরে বেরিয়ে গেল বক্স থেকে। ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বিতীয় দৃশ্যের পর্দা উঠছে।

কাউন্ট দ্য মরশার্ফ দেখলেন, মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেলেন মণ্টিক্রিস্টো। পরমুহূর্তে অজানা, দুর্বোধ্য এক ছায়া পড়লো তাঁর দু'চোখের দৃষ্টিতে। একমাত্র ভয় পেলেই মানুষের চোখে এমন ছায়া পড়তে পারে।

পাঁচ

কয়েকদিন পর প্যারিসের শীর্ষস্থানীয় এক দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় একটা সংবাদ প্রকাশিত হলো।

'ইয়ানিনা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা বহুদিন আগে সংঘটিত অবিশ্বাস্য এক দুর্নীতির সংবাদ প্রেরণ করেছেন। এমন একটি দুর্নীতির কথা কী করে এতদিন কর্তৃপক্ষের অগোচরে রয়ে গেল ভেবে আমরা বিস্মিত হচ্ছি।

'ইয়ানিনা শহরের উপকণ্ঠে অত্যন্ত সুরক্ষিত প্রাচীন এক দুর্গ আছে। শহরটির নিরাপত্তা প্রধানত ওই দুর্গের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, গত গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধের সময় কর্নেল ফার্নান্দ নামক জনৈক ফরাসি সেনাধ্যক্ষ গ্রীক দুর্গটিকে তুর্কীদের হাতে তুলে দেন বলে অভিযোগ আছে। গ্রীক নেতা আলী পাশা উক্ত কর্নেলকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে দুর্গ রক্ষার ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্নেল ফার্নান্দ সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দেন দুর্গটিকে তুর্কীদের হাতে তুলে দিয়ে। সেই থেকে নিজের খ্রীষ্টীয় নামের সঙ্গে একটি অভিজাত উপাধি জুড়ে নিয়েছেন কর্নেল। তিনি এখন নিজের পরিচয় দেন কাউন্ট দ্য মরশার্ফ বলে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, এই বিশ্বাসহন্তা কর্নেল সম্প্রতি হাউস অভ পিয়ারস* -এর সদস্য হয়েছেন।'

সেদিনই সকাল। হাউস অভ পিয়ারস-এ সমবেত হয়েছেন সদস্যরা। সভা চলছে। সবাই বেশ সকাল সকাল উপস্থিত আজ। সবাই কম বেশি উত্তেজিত। কাউন্ট দ্য মরশার্ফ সম্পর্কে যে খবরটা বেরিয়েছে আজকের সংবাদপত্রে সেটা নিয়ে জল্পনা, কল্পনা, আলোচনা করছেন সবাই। মরশার্ফ এঁদের খুব প্রিয়পাত্র তা নয়, বরং উল্টোটাই। এক কথায় বলতে গেলে লোকটাকে এঁরা হঠাৎ বড়লোক, ভুঁইফোঁড় বলে মনে করেন। বহুদিন ধরে তাঁরা সুযোগ খুঁজছিলেন তাঁকে জব্দ করার, আজ পেয়ে গেছেন। এবং পেয়েছেন মোক্ষম সুযোগটাই।

কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা, জল্পনা তিনি কিন্তু এসবের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। যে কাগজে খবরটা বেরিয়েছে সেটা তিনি রাখেন না, ফলে কিছুই জানতে পারেননি তিনি। এবং রোজ যে সময়ে আসেন আজও সে সময়ে হাজির হলেন হাউস-এ।

কাউন্ট মরশার্ফকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়ালেন জনৈক পিয়ার। সভাপতির

---

* পিয়ার (Peer)– অভিজাত শ্রেণীর সদস্য। হাউস অভ পিয়ারস জাতীয় সংসদ বা গণ পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে দেশের পিয়ার অর্থাৎ অভিজাতরা রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁদের ভূমিকা রাখতেন।

মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। তারপর পড়ে শোনালেন সেদিনের 'ল্ ইম্পারশিয়াল'-এ প্রকাশিত সংবাদটি।

হঠাৎ করেই মরশার্ফ অনুধাবন করলেন, সভায় উপস্থিত প্রতিটা সদস্যের দৃষ্টি তাঁর ওপর স্থির হয়ে আছে। ইয়ানিনা, ফার্নান্দ—নামগুলো শুনে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর মুখ। কী বলবেন কিছু বুঝতে পারলেন না।

পড়া শেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণকারী সদস্য সংবাদটির সত্যাসত্য নির্ণয়ের অনুরোধ জানালেন মাননীয় সভাপতিকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন সভাপতি।

'অভিযোগ গুরুতর,' শুরু করলেন তিনি। 'আমার বিশ্বাস সভায় উপস্থিত সবাই জানতে চান এ অভিযোগ সত্যি কি না। আমি নিজেও কৌতূহলী। সুতরাং, আমার মনে হয় বিষয়টির ওপর শুনানি হওয়া উচিত। অবশ্যই কাউন্ট দ্য মরশার্ফ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন।'

এরপর সভাপতি প্রস্তাবটির পক্ষে বিপক্ষে ভোট আহ্বান করলেন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হলো প্রস্তাব। শুনানি হবে।

'আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে কতদিন সময় দরকার আপনার, মাননীয় সদস্য?' কাউন্ট দ্য মরশার্ফকে জিজ্ঞেস করলেন সভাপতি।

উঠে দাঁড়ালেন মরশার্ফ। ঘামে ভিজে উঠেছে তাঁর মুখ। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'হাউস অভ পিয়ারস-এর প্রিয় সদস্যগণ, মাননীয় সভাপতি জানতে চেয়েছেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতির জন্যে কতদিন সময় দরকার আমার। আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের এই শুনানি অনুষ্ঠিত হোক। আপনাদের যদি কোনও অসুবিধা না থাকে, আমি আজ সন্ধ্যায়ই প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণসহ সভার সামনে হাজির হতে চাই।'

ঠিক হলো রাত আটটায় মূল সভাকক্ষে শুরু হবে শুনানি।

রাত আটটা বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকি। সভাকক্ষে উপস্থিত সবাই। যে দু'একজন সদস্য সকালে আসেননি তাঁরাও এখন হাজির হয়েছেন কাউন্ট মরশার্ফের বক্তব্য শুনতে। সবাই বসে গেছেন যার যার আসনে।

দেয়ালের বড় ঘড়িটা আটটা বাজার সংকেত ঘোষণা করতে শুরু করলো। শেষ ঘণ্টাটা যখন বাজছে তখন সভাকক্ষে ঢুকলেন কাউন্ট দ্য মরশার্ফ। হাতে কিছু কাগজপত্র। দৃঢ় পদক্ষেপে, অবিচল মুখে ঢুকলেন তিনি। প্রশান্ত দৃষ্টি দু'চোখে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বাররক্ষীদের একজন একটা চিঠি এনে দিলো সভাপতির হাতে। সীলমোহর ভেঙে চিঠিটা খুলতে খুলতে সভাপতি বললেন, 'আপনি শুরু করতে পারেন, মঁসিয়ে দ্য মরশার্ফ।'

শুরু করলেন কাউন্ট। আলী পাশা যে তাঁকে কতখানি বিশ্বাস করেছিলেন এক এক করে তার প্রমাণগুলো দেখাতে লাগলেন। তারপর দেখালেন আলী পাশার মোহরাঙ্কিত একটি আংটি, যে আংটির বলে তিনি দিন বা রাতের যে কোনও সময় আলী পাশার দুর্গে ঢোকার ও তার সাথে দেখা করার অধিকার

পেয়েছিলেন।

'আলী পাশা আমাকে এতটা বিশ্বাস করতো যে, মৃত্যু শয্যায় সে তার স্ত্রী ও কন্যার দেখাশোনার দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে যেতে কুণ্ঠিত হয়নি,' সবশেষে ঘোষণা করলেন মরশার্ফ।

এদিকে দ্বাররক্ষীর দিয়ে যাওয়া চিঠিটা খুলেছেন সভাপতি। ওটা পড়েই চমকে উঠলেন তিনি।

'মঁসিয়ে কাউন্ট,' জিজ্ঞেস করলেন সভাপতি, 'আলী পাশার স্ত্রী এবং কন্যার কী হয়েছে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে আপনার?'

'নিশ্চয়ই, মাননীয় সভাপতি। ওরা নিখোঁজ হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমি ওদের খুঁজে বের করতে পারিনি। আমার এই ব্যর্থতা যদি অপরাধ হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি অপরাধী।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সভাপতি। তারপর সভার উদ্দেশ্যে বললেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, একটু আগে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠির লেখক এমন একজন যে আলী পাশার মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে ছিলো। কাউন্ট মরশার্ফের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে চায় সে। এখন লবিতে অপেক্ষা করছে। ও লিখছে, গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হাজির করতে পারবে ল্ ইম্পারশিয়ালে যে সংবাদ ছাপা হয়েছে তার সপক্ষে।

'কে এই সাক্ষী!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন কাউন্ট মরশার্ফ।

'সভার অনুমতি পেলে শিগগিরই আমরা দেখতে পাবো।' সদস্যদের দিকে তাকালেন সভাপতি।

বেশ কয়েকজন সদস্য এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মাননীয় সভাপতি, সাক্ষীকে সভায় আসার অনুমতি দিন?'

'দ্বাররক্ষীকে ডাকো,' কেরানীকে নির্দেশ দিলেন সভাপতি।

কেরানী উঠে গিয়ে ডেকে আনলো দ্বাররক্ষীকে। সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'লবিতে কেউ আছে?'

'জি, স্যার, একজন ভদ্রমহিলা, সঙ্গে এক ভৃত্য।'

বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠলো সভাকক্ষে।

'ভদ্রমহিলাকে ভেতরে নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিলেন সভাপতি।

ঘোমটা টানা এক মহিলা ভেতরে ঢুকলো। সভাকক্ষের প্রতিটা চোখ হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার ওপর। মুখে ঘোমটা থাকা সত্ত্বেও কারো বুঝতে অসুবিধা হলো না, খুবই কম বয়েস মহিলার, সবে কৈশোর পেরিয়েছে বোধহয়। সভাপতির অনুরোধে মুখাবরণ সরালো সে। সদস্যরা দেখলেন, গ্রিসীয় পোশাক পরে আছে অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা। কয়েকজন সদস্য দেখামাত্র চিনে ফেললেন ওকে। কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টোর সঙ্গে এই মেয়েকেই সেদিন অপেরা হাউসে দেখেছিলেন তাঁরা। সভাকক্ষের পেছনে দর্শকদের গ্যালারিতে বসে ছিলো আলবার্ট দ্য মরশার্ফ, সে-ও চিনতে পারলো হেইডিকে।

দু'চোখ ভর্তি বিস্ময় আর আতঙ্ক নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকালেন কাউন্ট মরশার্ফ। পরমুহূর্তে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। পা দুটো আর রাখতে

পারছে না তাঁর শরীরের ওজন।

'মাদমোয়াজেল,' সভাপতি বললেন, 'আপনার চিঠিতে আপনি উল্লেখ করেছেন, বহুদিন আগে ইয়ানিনায় ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আপনি। কথাটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি নিশ্চয়ই খুব ছোট ছিলেন তখন?'

'আমি তখন চার বছরের, কিন্তু একটা কথাও ভুলিনি আমি। আমার নাম হেইডি, আলী পাশা আমার বাবা। এই যে আমার জন্ম তারিখ এবং পিতৃ-পরিচয়ের প্রমাণপত্র, আর এটা হলো আমার মা এবং আমাকে আমেরিকান দাসব্যবসায়ী এল-কবিরের কাছে বিক্রি করার প্রমাণপত্র। ফরাসি সেনাবাহিনীর কর্নেল ফার্নান্দ মনডেগো চার হাজার ফ্রাঁর বিনিময়ে আমাদের বিক্রি করেছিলো এল-কবিরের কাছে।' পোশাকের ভেতর থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে সভাপতির হাতে দিলো হেইডি।

প্রচণ্ড ভয় পেলে যেমন হয় তেমন সবুজাভ রং ধরেছে মরশার্ফের মুখ। তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে সভাপতি কাগজগুলো আরবী জানেন এমন এক সদস্যের হাতে দিলেন। উচ্চৈস্বরে পড়তে লাগলেন তিনি। প্রথম কাগজটায় লেখা হেইডির জন্ম তারিখ, জন্মস্থান ও পিতা-মাতার পরিচয়ের বিবরণ। দ্বিতীয় কাগজটা পড়লেন আরবী জানা সদস্য:

'আমি, এল-কবির, দাস ব্যবসায়ী, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টোর নিকট হইতে আট সহস্র ফ্রাঁ মূল্যের একখণ্ড পান্না পাইয়া আমি এগারো বৎসর বয়স্ক খ্রীষ্টান ক্রীতদাসী হেইডিকে মুক্তি প্রদান করিয়াছি। ইয়ানিনার দুর্গাধিপতি আলী পাশার কন্যা হেইডি ও তাহার মাতাকে আমি ফার্নান্দ মনডেগো নামক জনৈক ফরাসি দেশীয় কর্নেলের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলাম। এখানে উল্লেখ থাকে যে, কনস্টান্টিনোপ্‌ল-এ পৌছার অব্যবহিত পরেই হেইড়ির মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

'স্বাক্ষর: এল-কবির

'কনস্টান্টিনোপ্‌ল, ১২৪৭ হিজরি।'

ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে সভাকক্ষে। কাউন্ট মরশার্ফ পাথরের মতো বসে আছেন। তাঁর থুতনি ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর।

'মঁসিয়ে দ্য মরশার্ফ,' জিজ্ঞেস করলেন সভাপতি, 'চিনতে পারছেন এই মহিলাকে? আলী পাশার মেয়ে উনি?'

'না!' কঠোর কণ্ঠে বলার চেষ্টা করলেন মরশার্ফ, কিন্তু কঠোরতা তেমন ফুটলো না তাঁর গলায়। 'এসবই আমার শত্রুদের কারসাজি।'

'আমাকে তুমি চেনো না?' চিৎকার করে উঠলো হেইডি। 'বেশ, না চিনলে না-ই চিনলে, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি! ভালো করেই চিনি। তুমি ফার্নান্দ মনডেগো, আমার বাবা তাঁর সৈন্যদের পরিচালনার ভার তুলে দিয়েছিলেন তোমার হাতে। তুমি সেই লোক, যে বাবাকে কিছু না জানিয়ে ইয়ানিনার দুর্গ

সমর্পণ করেছিলে শত্রুর হাতে। কী করলে দুর্গ জয় সহজ হবে তা তুমিই জানিয়েছিলে তুর্কীদের! এখানেই ক্ষান্ত হওনি তুমি, একমাত্র আমার মা আর আমাকে ছাড়া আর সব প্রত্যক্ষদর্শীকে হত্যা করেছিলে তখন নির্দ্বিধায়। আমি ছোট ছিলাম, কিন্তু তোমার মুখ আমি ভুলিনি। তুর্কীদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে তুমি একাজ করেছিলে, তারপর আমাকে আর মাকে বিক্রি করে দিয়েছিলে দাস ব্যবসায়ী এল-কবিরের কাছে। বিশ্বাসঘাতক! খুনী! তোমার পাপ তোমার চেহারায় লেখা রয়েছে!'

এক হাতে কপালের ঘাম মুছছেন কাউন্ট মরশার্ফ। সভাকক্ষের প্রতিটা চোখ স্থির হয়ে আছে তাঁর মুখের ওপর। কিছু বলার জন্যে মুখ খুললেন তিনি, কিন্তু স্বর বেরোলো না গলা দিয়ে। এই সময় আচমকা উঠে দাঁড়ালেন তিনি। হিংস্র চোখে একবার তাকালেন হেইডির দিকে। তারপর পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন সভাকক্ষ থেকে। কামরার বাইরে ক্রমশ দূরে চলে গেল তাঁর ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ।

'মাননীয় সদস্যগণ' বললেন সভাপতি, 'আপনারা সব শুনলেন। এখন বলুন, আপনাদের বিবেচনায় কাউন্ট দ্য মরশার্ফ কি অপরাধী, না নিরপরাধ?'

'অপরাধী,' একবাক্যে জবাব দিলেন সবাই।

মাথা নুইয়ে সভাপতিকে অভিবাদন জানালো হেইডি। ঘোমটাটা আবার মুখের ওপর টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল সভাকক্ষ থেকে। ও যখন লবিতে ভৃত্যের সাথে হেঁটে যাচ্ছে গাড়ি বারান্দার দিকে তখন এক যুবক রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে চলে গেল ওর পাশ কাটিয়ে। বাইরে বেরিয়ে মিশে গেল রাতের অন্ধকারে।

যুবক আর কেউ নয়, আলবার্ট দ্য মরশার্ফ।

ছয়

কাউন্ট অভ মণ্টিক্রিস্টোর শঁজেলিজের বাড়িতে গিয়ে থামলো আলবার্ট মরশার্ফের গাড়ি। বার্তুচ্চিও এগিয়ে এলো অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে!

'কাউন্ট আছে?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো আলবার্ট।

'জি না, উনি তো অপেরায় গেছেন।'

'অপেরাহাউসে চলো!' কোচোয়ানের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লো আলবার্ট।

তৃতীয় দৃশ্য শেষ হয়েছে সবে। বক্সের সামনে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন কাউন্ট মণ্টিক্রিস্টো। সশব্দে দরজা খুলে ভেতরে এলো আলবার্ট। ওর পেছনে ওর এক বন্ধু। নাম বুশ্যাম্প। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনও কারণে অস্বস্তিতে ভুগছে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন কাউন্ট আলবার্টের জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে।

'ও তুমি,' বললেন তিনি। 'শুভ সন্ধ্যা, আলবার্ট। কেমন আছো?'

'আপনার সাথে খাতির জমানোর জন্যে আমি এখানে আসিনি,' কঠোর কণ্ঠে জবাব দিলো আলবার্ট। 'আমি চাই নির্জন কোনও স্থানে আপনি আমার মুখোমুখি হোন, তারপর হয় আপনি থাকবেন নয় আমি। কাউন্ট মন্টিক্রিস্টো আর আলবার্ট মরশার্ফ একসাথে থাকতে পারে না পৃথিবীতে!'

এত জোরে ও উচ্চারণ করলো কথাগুলো যে আশপাশের সবাই কৌতূহলী হয়ে ঘুরে তাকালো ওদের দিকে।

'বেশ, বেশ,' শান্তভাবে বললেন মন্টিক্রিস্টো, 'দেখতে পাচ্ছি তুমি আমার সাথে ঝগড়া বাধাতে চাও। জিজ্ঞেস করতে পারি, কেন?'

এক হাতে একটা দস্তানা ধরে আছে আলবার্ট, কাউন্টের প্রশ্ন শুনে হাতটা সে এমনভাবে ছুঁড়ে দিলো যে মনে হলো দস্তানা দিয়ে মন্টিক্রিস্টোর মুখে আঘাত করার জন্যেই সে এমন করলো। অবশ্য বুশ্যাম্প সময় মতো হাতটা ধরে ফেলায় দস্তানাটা লাগলো না কাউন্টের মুখে।

'উঁহুঁ, এর কোনও দরকার নেই, আলবার্ট,' বুশ্যাম্প বললো। 'তুমি কাউন্টকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছো, ব্যস চুকে গেছে। এখন সাহস থাকলে উনি লড়বেন তোমার সাথে, না থাকলে পালাবেন প্যারিস ছেড়ে।'

'জনাব আলবার্ট,' একটু সামনে ঝুঁকলেন মন্টিক্রিস্টো, 'আমি ধরে নিচ্ছি তোমার দস্তানা আমার মুখে আঘাত করেছে, বুলেট দিয়ে আমি এর জবাব দেবো। এখন কেটে পড়ো, না হলে চাকর ডেকে তোমাকে বের করে দিতে বাধ্য হবো।'

কাউন্টের হিম শীতল কণ্ঠস্বর শুনে পিছিয়ে এলো আলবার্ট, যদিও ওর চোখ দুটো এখনো আগের মতোই জ্বলছে ক্রোধে।

'মঁসিয়ে বুশ্যাম্প আমার সেকেণ্ড হিসেবে থাকবে, এবং সব ব্যবস্থা করবে,' বলে বক্স থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বুশ্যাম্পের দিকে তাকালেন কাউন্ট।

'আমি কী করেছি ওর?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ওর ধারণা আপনি ওর বাবার অপমানের জন্যে দায়ী,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিলো বুশ্যাম্প। 'আপনার আশ্রিতা, হেইডি, ওর বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং প্রমাণপত্র হাজির করেছে। আলবার্টের ধারণা, আপনার ইঙ্গিতেই এসব হয়েছে। তা না হলে ইয়ানিনায় কবে কী ঘটেছিলো তা নিয়ে এতদিন পর হৈ-চৈ বাধার কোনও কারণ নেই। সেজন্যেই ও আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছে।'

'এবং মানুষের সামনে অপমান করেছে। ওকে বলে দিও, কাল সকাল দশটার আগেই আমি ওকে হত্যা করবো। কোথায় লড়তে চাইবে তোমার বন্ধু? কখন? কী অস্ত্র ব্যবহার করবে এখনই বলে যাও।'

'পিস্তল। বোয়া ভিনসেনেস-এ কাল সকাল আটটার সময়,' বুশ্যাম্প বললো।

'ঠিক আছে, আমার কোনও আপত্তি নেই—এখন ভাগো, বাকি দৃশ্যগুলো দেখতে দাও আমাকে। আর শোনো, তোমার বন্ধুকে বোলো, আজ রাতে যেন আর না আসে আমার কাছে। বাসায় গিয়ে ঘুম লাগাতে বলো ওকে।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে কাউন্টের দিকে একবার তাকিয়ে বক্স থেকে বেরিয়ে গেল বুশ্যাম্প। শান্ত নিরুদ্বেগ মুখে অপেরার বাকি দৃশ্যগুলো দেখলেন কাউন্ট। পালা শেষে যখন ধীর পদক্ষেপে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন তখনও কোনও পরিবর্তন এলো না তাঁর মুখের ভাবে। অপেরা হাউস থেকে কাউন্টের বাড়ি পাঁচ মিনিটের পথ। বাড়িতে পৌঁছেই একান্ত ভৃত্যকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

'বার্তুচ্চিও, আমার পিস্তলটা নিয়ে এসো তো! ওই যে যেটা হাতির দাঁতের কাজ করা!'

নিয়ে এলো বার্তুচ্চিও। সাবধানে ওটা বাক্স থেকে বের করে পরীক্ষা করতে লাগলেন মন্টিক্রিস্টো। বারুদ, গুলি, ঠিক মতো ভরা আছে কি না দেখলেন, গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গিতে মহড়া দিলেন কয়েকবার। এমন সময় বার্তুচ্চিও এসে জানালো, একজন দর্শনার্থী এসেছেন।

একটু বিরক্ত হলেন কাউন্ট। পিস্তলটা বাক্সে ভরে রেখে পাশের ঘরে এলেন তিনি। দেখলেন অবগুণ্ঠনে আবৃত এক মহিলা। দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। কাউন্টকে দেখেই ছুটে এলেন মহিলা।

বার্তুচ্চিওর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন মন্টিক্রিস্টো। বেরিয়ে গেল একান্তভৃত্য। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই কাউন্টের দু'বাহু খামচে ধরলেন মহিলা।

'এডমণ্ড, আমার ছেলেকে তুমি হত্যা কোরো না! আমি মিনতি করছি, এডমণ্ড!'

চমকে উঠলেন কাউন্ট। 'কী নামে ডাকছেন আপনি আমাকে, মাদাম দ্য মরশার্ফ!'

'তোমার আসল নামে!' চিৎকার করে উঠলেন মাদাম মরশার্ফ, অবগুণ্ঠন ছুঁড়ে ফেললেন এক পাশে। 'এডমণ্ড, দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমাকে চিনেছি। তোমার সেই মুখ এখনো আমি ভুলিনি, এডমণ্ড!'

'আপনি কী বলছেন, মাদাম, কিছু বুঝতে পারছি না!'

'আমি মার্সিডিস, তোমার কাছে এসেছি, এডমণ্ড।'

'মার্সিডিস! মার্সিডিস মারা গেছে, মাদাম,' শান্ত কণ্ঠে বললেন মন্টিক্রিস্টো।

'না! ও বেঁচে আছে, এবং ও মনে রেখেছে। আমি আমার পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে, এডমণ্ড।'

'আমি আপনার ছেলের ক্ষতি করবো এ কথা কে আপনাকে বললো, মাদাম?'

'মঁসিয়ে বুশ্যাম্পের কাছে শুনলাম আলবার্ট নাকি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছে; ওর বাপের দুর্ভাগ্যের পেছনে নাকি তোমার হাত আছে তাই।'

'ও ভুল করেছে,' শীতল কণ্ঠে বললেন মন্টিক্রিস্টো। 'নিয়তিই ওর বাবাকে শাস্তি দিয়েছে। দুষ্কর্ম করলে শাস্তি পেতে হয়, এটা নিয়তির বিধান।'

'ফার্নান্দ মনডেগো আলী পাশার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাতে তোমার কী? তুমি কেন ফার্নান্দের পেছনে লেগেছো?'

'ঠিক বলেছেন, মাদাম, জনৈক ফরাসি কর্নেল আলী পাশার সাথে

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কি করেনি তাতে কিছু যায় আসে না আমার। তবে আমি শপথ করেছিলাম, মার্সিডিসের স্বামী জনৈক ফার্নান্দ মনডেগোর ওপর প্রতিশোধ নেবো, তাই আমি লেগেছি ওর পেছনে।'

'কিন্তু, এডমণ্ড, প্রতিশোধ যদি তোমাকে নিতেই হয়, সে তো নেয়ার কথা আমার ওপর, মার্সিডিসের ওপর,' বললো মাদাম মরশার্ফ। 'তোমার অনুপস্থিতি ও আমার নিঃসঙ্গতা আমি আর সইতে পারছিলাম না।'

'কেন আমি অনুপস্থিত ছিলাম?'

'কারণ—কারণ তুমি বন্দী হয়েছিলে।'

'কেন আমি বন্দী হয়েছিলাম?'

'আমি জানি না।'

'জানো না! এ-ও কি সম্ভব!'

'সত্যি বলছি, আমি জানি না, এডমণ্ড।'

'তাহলে বলছি শোনো, যেদিন আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিলো তার আগের দিন সন্ধ্যায় দাঁগলার আর ফার্নান্দ মিলে একটা চিঠি লিখেছিলো মার্সেই-এর বিচারককে। দেখবে সেই চিঠি?'

একটা ডেস্কের সামনে গিয়ে দেরাজ খুললেন মন্টিক্রিস্টো। বয়সের ভারে হলুদ হয়ে যাওয়া একটা কাগজ বের করে মার্সিডিসের হাতে দিলেন। তারপর বললেন, 'চিঠিটা এখনো নষ্ট হয়নি। সম্ভবত দাঁগলার বা ফার্নান্দ কারো মনে ছিলো না এটার কথা। থাকলে এটা ওরা নষ্ট করতোই। এই চিঠি সংগ্রহ করতে প্রচুর পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে আমাকে। দক্ষিণ ফ্রান্সের কারাগার পরিদর্শকের দপ্তরে এডমণ্ড দান্তের নামে যে সব নথিপত্র আছে সেগুলোর ভেতর পাওয়া গেছে এটা। কারাগার থেকে পালানোর সময় সাগরে ডুবে মরেছে এডমণ্ড দান্তে, সে কারণেই ঘুষের বিনিময়ে চিঠিটা পাচার করার সাহস পেয়েছে পরিদর্শক।'

চিঠিটা পড়লেন মাদাম মরশার্ফ। পড়তে পড়তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

'কী সাংঘাতিক!' অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি। 'এই চিঠি—।'

'আমার গ্রেপ্তার হবার কারণ। এবং সেজন্যেই আমি শপথ নিয়েছি, প্রতিশোধ নেবো ফার্নান্দের ওপর। মহান ঈশ্বরের করুণায় আমি কবর থেকে উঠে এসেছি ওদের শাস্তি দেয়ার জন্যে।'

'এডমণ্ড,' ধরা গলায় বললেন মাদাম মরশার্ফ, 'বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন তুমি এলে না, আমার ধারণা হয়েছিলো তুমি মারা গেছ। নিষ্ফল প্রার্থনা আর চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কী করতে পারতাম আমি? তাই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম ফার্নান্দকে। কিন্তু সত্যি বলছি, এক দিনের জন্যেও মনে আমি শান্তি পাইনি।'

'তোমার বাবা না খেতে পেয়ে মরেছে, এ-কথা শুনতে হয়েছে তোমাকে?' কম্পিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন মন্টিক্রিস্টো। 'তুমি যখন কারাগারের অন্ধ কুঠুরিতে পচে মরছো তখন তোমারই প্রেমিকা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর গলায় মালা

দিচ্ছে, কখনো দেখতে, শুনতে বা কল্পনা করতে হয়েছে তোমাকে?'

'না!' ফুঁপিয়ে উঠলেন মাদাম মরশার্ফ। 'ওসব আমি শুনিনি, দেখিনি। কিন্তু একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, আমি যাকে ভালোবাসতাম সে আমার ছেলেকে হত্যা করতে যাচ্ছে! তিলতিল করে যাকে গড়ে তুলেছি আমার সেই সন্তান আজ মৃত্যুর দুয়ারে!'

এ কথার কোনও জবাব দিলেন না মণ্টিক্রিস্টো। নীরবে তাকিয়ে রইলেন মার্সিডিসের মুখের দিকে। দু'চোখ থেকে ধারা নেমেছে ওর। সেই ধারায় ভিজে গলে গেল কাউন্টের মন। সব কঠোরতা, কাঠিন্য কোথায় মিলিয়ে গেল। অদ্ভুত করুণ এক কোমলতার ছাপ পড়লো তাঁর মুখে।

'আমার কাছে কী চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'তোমার ছেলের জীবন? ঠিক আছে, ও মরবে না।'

বড় বড় দুই চোখ তুলে তাকালেন মাদাম মরশার্ফ কাউন্টের দিকে। আশায় চকচক করছে চোখ দুটো। ঝট করে কাউন্টের একটা হাত তুলে নিয়ে আলতো করে একবার ছোঁয়ালেন ঠোঁটে।

'ধন্যবাদ, এডমণ্ড,' বললেন তিনি। 'আবার তোমাকে আমার সেই চেনা মানুষটার মতো লাগছে, যাকে আজীবন আমি ভালোবেসে এসেছি। আলবার্ট মরবে না মানে কি ডুয়েল লড়বে না তুমি?'

'ডুয়েল হবেই, ওটা ঠেকানোর কোনও উপায় নেই। তবে তোমার ছেলের বদলে আমার রক্তে ভিজবে বোয়া ভিনসেনেস-এর মাটি।'

অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরোলো মাদাম মরশার্ফের গলা দিয়ে। এবং পরমুহূর্তে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে কান্নার ভেতরেও হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে।

'এডমণ্ড,' চোখের পানি মুছতে মুছতে মাদাম মরশার্ফ বললেন, 'আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার সৌন্দর্য যদি ম্লান হয়ে গিয়েও থাকে, তুমি দেখো, মার্সিডিসের হৃদয়টা এখনো আগের মতোই আছে। আসি তাহলে, এডমণ্ড, অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

কোনও জবাব দিলেন না কাউন্ট। দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন মাদাম মরশার্ফ।

ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মণ্টিক্রিস্টো। তারপর বসেই রইলেন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনে।

সাত

কাঁটায় কাঁটায় সকাল আটটায় বোয়া ভিনসেনেস-এ পৌঁছুলো কাউন্ট অভ মণ্টিক্রিস্টোর গাড়ি। কাউন্ট দেখলেন দু'জন আরোহীসহ আরেকটা গাড়ি আগে থেকেই অপেক্ষা করছে সেখানে। একজনকে চিনতে পারলেন তিনি, মঁসিয়ে

বুশ্যাম্প। কালো পোশাক পরে আছে। কাউন্টকে দেখে সম্ভাষণ জানানোর জন্যে গাড়ি থেকে নেমে এলো সে।

'মঁসিয়ে দ্য মরশার্ফ এখনো এসে পৌঁছোননি,' বললো বুশ্যাম্প। 'শিগগিরই এসে যাবে...।' এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। ঘাড় ফিরিয়ে বুশ্যাম্প যোগ করলো, 'এই তো এসে গেছে।'

তাকিয়ে রইলেন কাউন্ট অশ্বারোহীর দিকে। ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে টগবগিয়ে ছুটে আসছে।

ওদের একেবারে কাছে পৌঁছে লাগাম টেনে ধরলো আলবার্ট। ঘোড়া থেকে নামলো। টকটকে লাল ওর চোখ দুটো, একটু ফোলা ফোলা। সন্দেহ নেই সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করেনি। ওকে দেখেই পিস্তলের বাক্স নিয়ে এলো বুশ্যাম্প তার গাড়ি থেকে। বাক্স খুলে একটা পিস্তল বের করে নামিয়ে রাখলো ঘাসের ওপর।

'দাঁড়াও একটু,' বললো আলবার্ট। 'কাউন্টের সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই আমি।'

অবাক হলো বুশ্যাম্প ও তার সঙ্গী। অবশ্য মুখে কিছু বললো না। আলবার্ট কাউন্টের আরেকটু কাছে এসে দাঁড়ালো। প্রশ্নবোধক চোখে তাকালেন কাউন্ট।

'কাল আপনাকে অহেতুক অপমান করেছি, স্যার,' আলবার্ট বললো। 'আমি ভেবেছিলাম বাবাকে শাস্তি দেয়ার কোনও অধিকার নেই আপনার। কিন্তু পরে জানতে পেরেছি, না, যথেষ্ট কারণ আছে। আমি শুনেছি ফার্নান্দ মনডেগোর কারণে কী দুঃসহ দুর্ভোগ আপনাকে পোহাতে হয়েছে, এবং আমি বলছি, এরা সবাই সাক্ষী, আপনি ঠিকই করেছেন প্রতিশোধ নিয়ে। আমি হলেও এ-ই করতাম! মঁসিয়ে কাউন্ট, আশা করি আমার অভদ্র আচরণ আপনি ক্ষমা করবেন।'

বুশ্যাম্প বা তার সঙ্গী বজ্রপাত হলেও বোধহয় এতটা আশ্চর্য হতো না, আলবার্টের কথা শুনে যতটা হয়েছে।

'তুমি খুব সাহসী ছেলে, মঁসিয়ে মরশার্ফ,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন কাউন্ট। আলবার্টের হতভম্ব বন্ধুদের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, 'তোমরা কিছু মনে না করলে আমি একটু একা আলাপ করতে চাই মঁসিয়ে দ্য মরশার্ফের সঙ্গে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' বলতে বলতে দূরে চলে গেল আলবার্টের দুই বন্ধু। ক্লান্ত বিধ্বস্ত আলবার্টের দিকে তাকালেন কাউন্ট।

'তোমার মা নিশ্চয়ই বলেছে বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কথা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মাথা ঝাঁকালো আলবার্ট।

'বুঝতেই পারছো, আর কখনো আমরা আগের মতো বন্ধু হতে পারবো না, তবে আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে পরম শ্রদ্ধার সাথেই আমরা একে অপরকে স্মরণ করবো।'

বলতে বলতে একটা হাত এগিয়ে দিলেন তিনি। আলবার্ট সেটা ধরে একটু

চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলো।

'তোমার মা আর তুমি এবার কী করবে জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। বলবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করলেন মন্টিক্রিস্টো।

'মা সংসার ত্যাগ করবেন ঠিক করেছেন। কোনও আশ্রমে চলে যাবেন। আমি মা-র সাথে আলাপ করে দেখেছি, কিছুতেই নড়চড় হবে না তাঁর সিদ্ধান্ত। আর আমি, মঁসিয়ে, ঠিক করেছি, ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে যোগ দেবো। ফ্রান্স থেকে দূরে চলে যেতে পারবো তাহলে, এসব কথা ভুলতে পারবো। বিদায়, মঁসিয়ে কাউন্ট।'

মাথা নুইয়ে আলবার্ট সম্মান জানালো মন্টিক্রিস্টোকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল বন্ধুদের দিকে।

'ছেলেটা আমার হতে পারতো,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বললেন কাউন্ট। ধীর পায়ে ফিরে চললেন নিজের গাড়ির দিকে।

সেদিনই বিকেল।

বসার ঘরে বসে হেইডির সাথে আলাপ করছেন কাউন্ট। দরজা খুলে বাতুর্চিও ঘোষণা করলোঃ

'কাউন্ট দ্য মরশার্ফ এসেছেন!'

ভয় পাওয়া কণ্ঠে অস্ফুট একটা চিৎকার করলো হেইডি, কিন্তু কাউন্টের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'সেই লোকটা!' আর্তনাদের মতো শোনালো হেইডির কণ্ঠস্বর।

কাউন্ট উঠে দাঁড়িয়ে ওর একটা হাত তুলে নিলেন। বললেন, 'ভেবো না, হেইডি, ও আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কিছু যদি হয় ওরই হবে, আমার নয়।'

কাউন্টের চোখের দিকে চাইলো হেইডি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর আস্তে মাথা ঝাঁকালো।

'তোমাকে বিশ্বাস করি আমি,' ফিসফিস করে বললো সে।

একটু ঝুঁকে মেয়েটার কপালে আলতো করে চুমু খেলেন মন্টিক্রিস্টো। তারপর এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

দরজা খুলে পাশের ঘর—অর্থাৎ বাইরের মানুষের সাথে সাক্ষাতের কক্ষে ঢুকলেন কাউন্ট। দেখলেন ঘরের এমাথা ওমাথা পায়চারি করছেন কাউন্ট দ্য মরশার্ফ। টেবিলের ওপর একটা সামরিক আলখাল্লা, তার ওপর রাখা দুটো তলোয়ার, কোষবদ্ধ। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মরশার্ফের মুখোমুখি হলেন মন্টিক্রিস্টো। তীব্র ঘৃণায় কালো হয়ে আছে মরশার্ফের মুখ।

'আজ সকালে আমার ছেলের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ।'

'এবং আমার বিশ্বাস, তোমার সাথে লড়াই করার—তোমাকে খুন করার সঙ্গত কারণ ছিলো ওর।'

'হয়তো। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছে, ও আমাকে খুন করেনি, এমনকি লড়েওনি আমার সাথে।'

'নিশ্চয়ই ক্ষমা চেয়েছিলে ওর কাছে।'

'ও-ই আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে—কারণ ও জানতে পেরেছে, আমার চেয়েও জঘন্য অপরাধ করে একজন দিব্যি ভদ্রসমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'কে সে?'

'তারই বাবা।'

রক্তশূন্য হয়ে গেল কাউন্ট মরশার্ফের মুখ। অবশ্য সামলে নিলেন তক্ষুণি।

'হুঁ, তা হতে পারে,' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন তিনি। 'কিন্তু তুমি জানো, মানুষের স্বভাবই হচ্ছে দোষ করে ধরা না পড়ার চেষ্টা করা। আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে এসেছি, অন্তর থেকে আমি তোমাকে ঘৃণা করি, সারাজীবন তোমাকে ঘৃণা করে যাবো। তুমি আমার কী ক্ষতি যে করেছো তা যদি তুমি বুঝতে! দেশের অভিজাত সমাজের সামনে আমাকে অপদস্থ করেছো, আমার স্ত্রী এবং পুত্রের মন বিষিয়ে দিয়েছো আমার ওপর! তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না, মন্টিক্রিস্টো। যে ক্ষতি আমার করেছো তার শোধ আমি নেবো না? আমার ছেলে লড়েনি, বেশ, আমিই লড়বো। প্রস্তুত হও!'

হাসলেন মন্টিক্রিস্টো।

'শুনেছি কাউন্ট দ্য মরশার্ফ ভালো তলোয়ারবাজ,' বললেন তিনি। 'আমিও অবশ্য একটু আধটু যে চর্চা করিনি তা নয়, এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারি, আগেই ধারণা করেছিলাম, তাই সময় থাকতে শিখে নিয়েছিলাম বিদ্যেটা। সুতরাং লড়ার ব্যাপারে আপত্তি নেই আমার।'

'বেশ, বেশ, তবে একটা কথা জানো তো, এ ধরনের লড়াই তখনই শেষ হয় যখন দু'জনের একজন মারা পড়ে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন মন্টিক্রিস্টো। কোটটা খুলে ছুঁড়ে দিলেন একধারে।

'কথা না বলে শুরু করাটাই বোধহয় ভালো, নাকি?' বলতে বলতে ছোট একটা টেবিল লাথি মেরে এক পাশে সরিয়ে দিলেন মন্টিক্রিস্টো। এক টানে খাপ থেকে খুলে নিলেন একটা তলোয়ার।

দ্রুত হাতে কোট খুলে ফেললেন মরশার্ফ। তিনিও একটা তলোয়ার তুলে নিলেন।

মুখোমুখি দাঁড়ালেন দুই কাউন্ট। দু'জনেরই চোখ অপরজনের চোখের দিকে। দু'জনেরই চোখে ধক ধক করে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। দু'জনেই দাঁতে দাঁত চেপে প্রস্তুত।

অপেক্ষা করছেন দু'জন। দু'জনই চাইছেন, প্রতিপক্ষ আগে আক্রমণ করুক। নিঃশব্দ কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মরশার্ফই লাফ দিলেন প্রথম। তলোয়ারটা নামিয়ে এনে সোজা চালালেন মন্টিক্রিস্টোর বুক লক্ষ্য করে। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে পেছনে সরে এলেন কাউন্ট। তলোয়ার নামিয়ে এনে তাচ্ছিল্যের সাথে সরিয়ে দিলেন মরশার্ফের তলোয়ারটা। হাসলেন একটু। পরমুহূর্তে চালালেন নিজের তলোয়ার। একই রকম দক্ষতায় আক্রমণটা

প্রতিহত করলেন মরশার্ফ, এবং প্রতি আক্রমণ করলেন।

লড়াই চলছে। কিন্তু কেউ কাউকে আহত করতে পারছে না। ঠকাস ঠকাস করে একটা ইস্পাতের ফলা আঘাত করছে অন্যটাকে। লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে যাচ্ছেন একজন যোদ্ধা, পরমুহূর্তে আবার আক্রমণ করছেন। প্রতিপক্ষও পিছিয়ে গিয়ে ঠেকাচ্ছেন আক্রমণ, তারপর আবার এগিয়ে এসে তলোয়ার চালাচ্ছেন। দু'জনই সতর্ক। দু'জনই জানেন, একটু ভুল করলেই মাশুল দিতে হবে প্রাণ দিয়ে।

প্রথম কয়েক মিনিট মনে হলো বুঝি অনন্তকাল ধরে চলবে এই তলোয়ারের ঝলকানি আর লাফ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া আর পিছিয়ে আসা। কিন্তু তারপরই আচমকা প্রচণ্ড এক লাফ দিলেন মণ্টিক্রিস্টো, সেই সাথে অদ্ভুত ভাবে হাত ঘুরিয়ে সর্বশক্তিতে আঘাত হানলেন মরশার্ফের তলোয়ারে। বিদ্যুৎবেগে তলোয়ারটা ছিটকে চলে গেল মরশার্ফের হাত থেকে। ঠকাস করে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে, আছড়ে পড়লো মাটিতে। পরমুহূর্তে মরশার্ফকে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরলেন মণ্টিক্রিস্টো; তাঁর তলোয়ারের ফলা চেপে বসেছে মরশার্ফের গলায়।

নিষ্কম্প হাতে কাউণ্ট মরশার্ফের গলায় তলোয়ার চেপে ধরে আছেন মণ্টিক্রিস্টো। অদ্ভুত এক হিমশীতল উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বল করছে তাঁর দু'চোখ। অন্য দিকে মরশার্ফের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মৃত্যু ভয়। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছে মৃদু মৃদু, যখন নিশ্বাস ফেলছেন, ফোঁপানির মতো শব্দ হচ্ছে। কাউণ্টের শেষ আঘাত, গলায় চেপে বসা তলোয়ারে সামান্য একটু চাপের অপেক্ষা করছেন তিনি। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছেন মণ্টিক্রিস্টো মরশার্ফের দিকে, তার দুরবস্থা যেন প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন তিনি।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। মরশার্ফ অনুভব করলেন, ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে তাঁর দাঁত, পা দুটো ভেঙে আসতে চাইছে। মণ্টিক্রিস্টোও বুঝলেন তাঁর অবস্থাটা। মরশার্ফকে ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে এলেন তিনি। তলোয়ার নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'এখনো আমাকে চিনতে পারোনি, ফার্নান্দ? মার্সিডিসকে বিয়ে করার পর অনেক রাতেই তো আমাকে তোমার স্বপ্ন দেখার কথা। তোমার না হয়ে আমার স্ত্রী হওয়ার কথা ছিলো মার্সিডিসের।'

দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মরশার্ফ। বিভ্রান্ত দৃষ্টি চোখে। মণ্টিক্রিস্টোর কথাগুলো যেন কোনও প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি তাঁর মনে।

'ফার্নান্দ!' আবার বললেন মণ্টিক্রিস্টো, 'আমি এডমণ্ড দান্তে!'

ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন মরশার্ফ। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন—পা দুটো আর বইতে পারছে না তাঁর ওজন।

'এডমণ্ড দান্তে!' কোনওমতে উচ্চারণ করলেন তিনি। তারপর দেয়াল ধরে ধরে আস্তে, প্রায় পিছলে এগিয়ে যেতে লাগলেন দরজার দিকে। মণ্টিক্রিস্টো দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। বিদ্রূপ মেশানো হাসি নিয়ে কাউণ্ট দ্যু মরশার্ফকে দেখছেন তিনি।

দরজার কাছে পৌঁছুলেন মরশার্ফ। ভয়ে ভয়ে একবার তাকালেন

মণ্টিক্রিস্টোর দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মতো ছুটে গেলেন বাইরে। গাড়ি-বারান্দার কাছে পৌঁছে তাঁর কোচোয়ানের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলেন, 'আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো!'

খুব বেশিক্ষণ লাগলো না বাড়ি পৌঁছতে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো গাড়ি থেকে নেমে এলেন কাউন্ট মরশার্ফ। বাড়ির সামনের দরজা হাট করে খোলা দেখে একটু থমকে গেলেন। একটা ভাড়াটে ঘোড়াগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের মাঝখানে। আতঙ্কিত চোখে গাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি ছুটে গেলেন খোলা দরজার দিকে।

ঘরে ঢুকে দেখলেন, সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে দু'জন মানুষ। দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে ওদের দৃষ্টি থেকে বাঁচলেন মরশার্ফ। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলেন, তাঁর ছেলে বলছে:

'চলো, মা, এটা আর আমাদের বাড়ি নয়।'

ঘরের বাইরে মিলিয়ে গেল ওদের পদশব্দ। জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন কাউন্ট মরশার্ফ। ভাড়া করা গাড়িটায় উঠছে তাঁর প্রিয় স্ত্রী-পুত্র। ছেড়ে দিলো গাড়ি। একবারের জন্যেও জানালায় দেখা গেল না মার্সিডিস বা তার ছেলের মুখ। ধীরে ধীরে জানালার কাছ থেকে সরে এলেন কাউন্ট মরশার্ফ।

গাড়িটা যখন ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখন একটা গুলির শব্দ ভেসে এলো বাড়ির ভেতর থেকে। এক সেকেণ্ড পর একটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো গাঢ় ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কোচোয়ান, ভৃত্যরা ছুটে গিয়ে দেখলো মাটিতে নিস্পন্দ পড়ে আছেন কাউন্ট দ্য মরশার্ফ।

মৃত্যু হয়েছে ফার্নান্দ মনডেগোর।

আট

শঙ্কা! ভয়! আতঙ্ক! এই তিনের হাতের মুঠোয় চলে এসেছেন ব্যারন দাঁগলার।

ডেস্কের সামনে বসে আছেন তিনি। দ্রুত হাতে একটা কাগজের ওপর হিসেব কষছেন। একবার শেষ হতেই আবার গোড়া থেকে শুরু করছেন হিসেব। কিন্তু ফলাফল একই হচ্ছে বার বার। শেষ হয়ে গেছেন দাঁগলার! কিন্তু কেমন করে কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে তাঁর প্রতিটা বিনিয়োগ ভুল হয়েছে। কখনো ভুল করেন না বলে সারা প্যারিসে যে দাঁগলারের সুখ্যাতি ছিলো তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহে কয়েক মিলিয়ন ফ্রাঁ খুইয়েছেন স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবসায়ে। বিশাল সম্পদ নিয়ে কেউ তাঁকে সর্বস্বান্ত করার চক্রান্তে মেতেছে যেন। কিন্তু কী করে তা সম্ভব? কে আছে এত সম্পদশালী, কেনই বা সে এমন করে দাঁগলারের পেছনে লাগবে?

ব্যারন দাঁগলারের জন্যে বড় দুর্ভাগ্যজনক এ বছরটা। তাঁর অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু

ভিলফোর্ত আর ফার্নান্দ মারা গেছেন। একজন নিহত হয়েছেন অজ্ঞাত আততায়ীর ছুরিকাঘাতে, অন্যজন আত্মহত্যা করেছেন। অশুভ কিছু একটার অস্তিত্ব থেকে থেকে অনুভব করেন ব্যারন তাঁর চারপাশে। কিন্তু কী যে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। মাঝে মাঝে মনে হয় প্রতিহিংসাপরায়ণ কোনও হাত যেন এগিয়ে আসছে। ভিলফোর্ত আর ফার্নান্দকে শেষ করেছে, এবার তাঁর পালা?

দরজায় ঠকঠক আওয়াজ শুনে চমকে উঠলেন ব্যারন। তাড়াতাড়ি হাতের কাগজটা একটা দেরাজে ঢুকিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

'কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো এসেছেন, স্যার,' দরজাটা সামান্য ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করলো কেরানী।

'পাঠিয়ে দাও।'

কাউন্ট যখন ভেতরে ঢুকলেন অতি কষ্টে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারলেন ব্যারন দাঁগলার।

'কিছু যদি মনে না করেন একটু বসুন,' বললেন তিনি। 'আপনি ঢোকার ঠিক আগে পাঁচটা ছোট ছোট নির্দেশপত্রে সই করছিলাম আমি। ওগুলো একটু গুছিয়ে রাখি, তারপরই আপনার সাথে আলাপ করবো।'

'কীসের নির্দেশপত্র?' জিজ্ঞেস করলেন কাউন্ট।

'ব্যাঙ্ক অভ ফ্রান্সের কাছে নির্দেশ, বাহককে টাকা দেয়ার। আপনি তো অসম্ভব ধনী, নিশ্চয়ই হরহামেশা এমন নির্দেশপত্র লিখতে হয় আপনাকে?'

'দেখি, দেখি,' নির্দেশপত্রগুলো নিজের দিকে টেনে নিলেন কাউন্ট। একটা হাতে তুলে নিয়ে পড়লেন:

'ব্যাঙ্ক অভ ফ্রান্সের গভর্নরের প্রতি,

'অনুগ্রহপূর্বক আমার নির্দেশে আমার জমা করা তহবিল থেকে এক মিলিয়ন ফ্রাঁ প্রদান করুন।

'ব্যারন দাঁগলার।'

'অর্থাৎ পাঁচটা নির্দেশপত্রে মোট পাঁচ মিলিয়ন!' সবিস্ময়ে মন্টিক্রিস্টো বললেন। 'অর্থ যোগানোর রাজা দেখছি আপনি, অ্যাঁ! নিজের চোখে দেখলাম বলে কথা, না হলে তো বিশ্বাসই করতে পারতাম না, এই একেক টুকরো কাগজ দেখালেই ব্যাঙ্ক অভ ফ্রান্স এক মিলিয়ন ফ্রাঁ দেবে!'

'হ্যাঁ,' গর্বিত কণ্ঠে বললেন দাঁগলার। 'এমনি করেই আমি ব্যবসা করি।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কাউন্ট দাঁগলারের দিকে। তারপর নির্দেশপত্রগুলো ভাঁজ করতে লাগলেন পকেটে ঢোকানোর জন্যে।

'খুব সুবিধা এগুলোয়,' বললেন তিনি। 'বস্তাভর্তি টাকা বয়ে নিয়ে বেড়ানোর ঝামেলা নেই। প্রয়োজন মতো একটা করে নিয়ে যাবো ব্যাঙ্ক অভ ফ্রান্সে, নির্ঝঞ্ঝাটে এক মিলিয়ন তুলে নিয়ে আসবো। সত্যি কথা বলতে কী পাঁচ মিলিয়ন ধার নেয়ার জন্যেই আজ এসেছিলাম। এই দেখুন, আগে থাকতে রশিদও লিখে এনেছি। আপনি নিজে বা লোক মারফত এটা আমার ব্যাঙ্কে পৌঁছে দেবেন, হাতে হাতে টাকা পেয়ে যাবেন। আজই হঠাৎ করে টাকার খুব

দরকার পড়ে গেছে আমার, দু'চারদিন যদি দেরি করা যেতো তাহলে আনিয়ে নিতে পারতাম রোম থেকে।'

এক হাতে নির্দেশপত্রগুলো পকেটে রাখলেন কাউন্ট, অন্য হাতে বের করে আনলেন রশিদটা। এগিয়ে দিলেন দাঁগলারের দিকে।

রীতিমতো আতঙ্কিত চেহারা হয়েছে ব্যারন দাঁগলারের।

'কী!' কোনও মতে একটা ঢোক গিলে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'এ টাকা আপনি নেবেন? মাফ করবেন, এটা তো হাসপাতালের টাকা। আজ বিকেলেই ওদেরকে পৌঁছে দিতে হবে।'

'ও,' বললেন মন্টিক্রিস্টো, 'তাহলে আমাকে অন্যভাবে দিন। বললাম না টাকার খুব দরকার আমার। রোম থেকে যে আনিয়ে নেবো সে সময় নেই। অবশ্য আমাকে আরো পাঁচ মিলিয়ন ফ্রাঁ দেয়ার ক্ষমতা যদি আপনার ব্যাঙ্কের না থাকে তাহলে অন্য কথা। আমি ভেবেছিলাম সবাইকে বলতে পারবো, চাইবার সঙ্গে সঙ্গে হাউস অভ দাঁগলার আমাকে আরো পাঁচ মিলিয়ন ফ্রাঁ দিয়েছে। বুঝতে পারছি তা আপনি পারবেন না। বেশ নিন তাহলে আপনার নির্দেশপত্রগুলো...'

প্রবল চেষ্টায় নিজেকে শান্ত রাখলেন দাঁগলার। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'কী বোকা আমি, এতক্ষণ ভেবেই পাচ্ছিলাম না কী করে আপনার সমস্যার সমাধান করবো, যেন একটা ফ্রাঁ অন্য আরেকটা ফ্রাঁ থেকে আলাদা। আপনার রশিদ মানেই তো টাকা, তাই না, মঁসিয়ে কাউন্ট?'

'নিশ্চয়ই। রোমের হাউস অভ থমসন অ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ আমার রশিদ দেখানো মাত্র আপনাকে টাকা দিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে বণ্ডগুলো আপনি রাখুন তাহলে,' কাষ্ঠ হাসি হাসলেন ব্যারন।

'ধন্যবাদ,' বলে উঠে দাঁড়ালেন মন্টিক্রিস্টো। দরজার কাছে গিয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন বাইরে। একটু পরেই শোনা গেল তাঁর গাড়ির চাকার ঘড় ঘড় শব্দ।

থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন দাঁগলার; মুখটা ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। কিছুক্ষণ ভাবলেন কী যেন; তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে সব ক'টা দেরাজ খালি করলেন। বেছে বেছে কয়েকটা কাগজ নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। কাগজগুলো যখন ছাই হয়ে গেল এক তাড়া নোট পকেটে ভরলেন তিনি।

দু'ঘণ্টা পর বার্তুচ্চিও ছুটতে ছুটতে এসে কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টোকে খবর দিলো, 'ব্যারন দাঁগলার, স্যার, প্যারিস ছেড়ে চলে গেছেন। একটা ডাকবাহী গাড়িতে উঠতে দেখলাম ওঁকে। আপনার গাড়িও তৈরি, স্যার।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালেন কাউন্ট।

'বেশ, বেশ!' বললেন তিনি। 'বোধহয় আমি জানি ও কোথায় যাচ্ছে। রোমে আবার ওর সাথে দেখা হবে আমাদের।'

নয়

কয়েক দিন পর। দুপুর বেলা। পোর্ট ডেল পোপোলো দিয়ে রোমে প্রবেশ করলো একটা ডাকবাহী গাড়ি। প্রধান সড়ক ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁয়ে মোড় নিলো। হোটেল দ'স্পেন-এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। একজন ভ্রমণকারী; চেহারা, বেশভূষা দেখে মনে হয় ফরাসি; নামলেন গাড়ি থেকে। সোজা হোটেলের খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। দামী, সুস্বাদু কিছু খাবারের নির্দেশ দিলেন।

খাবার আসার পর চটপট খেয়ে নিলেন ফরাসি ভদ্রলোক। খাবারের দাম মেটানোর সময় খানসামার কাছে জানতে চাইলেন থমসন অ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কের ঠিকানা। বিনীত ভঙ্গিতে ঠিকানাটা জানালো খানসামা। লিখে নিলেন ভদ্রলোক। তারপর ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলেন হোটেল থেকে।

বাইরে তখন সবেমাত্র ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে এনেছে কোচোয়ান, তখনো জোড়া হয়নি গাড়ির সঙ্গে। বিরক্ত দৃষ্টিতে একবার তাকালেন ভদ্রলোক, তারপর কোচোয়ানকে ডেকে ব্যাঙ্কের ঠিকানা দিয়ে বললেন, 'আমি হেঁটেই চলে যাচ্ছি, ঘোড়াগুলো জোড়া হলে তুমি চলে এসো গাড়ি নিয়ে। আমি যতক্ষণ না বেরোই ততক্ষণ অপেক্ষা করবে ব্যাঙ্কের সামনে।'

হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। একজন লোক যে অনুসরণ করে আসছে খেয়ালই করলেন না।

বেশিক্ষণ লাগলো না ব্যাঙ্কে পৌঁছুতে। দরজা পেরিয়ে প্রথম ঘরটায় ঢুকলেন ভদ্রলোক। একজন কেরানী কাজ করছিলো সে ঘরে, তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

'বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'এই ব্যাঙ্কের পরিচালকের সাথে দেখা করতে চাই।'

'একটু বসতে হবে আপনাকে। অনুগ্রহ করে আপনার নামটা বলবেন?'

'ব্যারন দাঁগলার।'

মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো কেরানী, তারপর একটা দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বললো, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

ওঁরা ভেতরের ঘরে অদৃশ্য হতে না হতেই ব্যাঙ্কে ঢুকলো সেই লোকটা যে দাঁগলারকে অনুসরণ করে আসছিলো। দেয়ালের পাশে একটা বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো কেরানীর জন্যে।

মিনিট দশেক পর ফিরে এলো কেরানী। নিজের ডেস্কে বসে কলম তুলে নিলো। হঠাৎ করেই যেন চোখ পড়লো অপেক্ষমাণ লোকটার দিকে।

'কে! পেপিনো! তুমি এসে গেছো!' বললো সে।

'হ্যাঁ,' বেঞ্চে বসা লোকটা জবাব দিলো। 'আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি, ভুল

তথ্য দিয়ে এবার আর পার পাবে না।'

'মানে! ভুল তথ্য আবার কবে দিলাম? ও, সেই ইংরেজটার কথা বলছো? সেদিন যে ত্রিশ হাজার লিভ্‌র নিয়ে গেল আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে?'

'হ্যাঁ। ত্রিশ হাজার নয়, মাত্র বাইশ হাজার লিভ্‌র ছিলো ওর কাছে।'

'ভালো করে তল্লাশি চালাওনি তোমরা তাহলে।'

'লুইগি ভ্যামপা নিজে তল্লাশি করেছে।'

'আচ্ছা!··· যাকগে, যা হয়েছে হয়েছে। এবারের অঙ্কটা কিন্তু খুব বড়।'

'পাঁচ বা ছয় মিলিয়ন, তাই না?' বললো পেপিনো। 'কাউন্ট অভ মণ্টিক্রিস্টোর রশিদের বিনিময়ে।'

'হ্যাঁ। এত সব খবর তুমি জানলে কী করে?'

'জানতে হয়।'

'পাঁচ মিলিয়ন!' বললো কেরানী। 'এবারের দাঁওটা তোমরা ভালোই মারবে মনে হচ্ছে, কী বলো, পেপিনো?'

'চুপ! ব্যাটা আসছে!'

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়লো কেরানী। মন দিয়ে কাজ করতে লাগলো। আর পেপিনো উঠে কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

খুশি ঝলমলে মুখ নিয়ে বেরিয়ে এলেন দাঁগলার ব্যাঙ্ক থেকে। গাড়ি তৈরিই ছিলো। বিশ বছরের তরুণের মতো লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। গাড়ির বাইরে পেছন দিকে যে অতিরিক্ত আসনটা থাকে সেটায় উঠে বসলো পেপিনো। ব্যারন দাঁগলার বা কোচোয়ান কেউ দেখতে পেলো না।

'কোন পথে যাবো?' জিজ্ঞেস করলো কোচোয়ান।

'অ্যালকোনা রোড,' বললেন ব্যারন।

লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করলো ঘোড়াগুলো।

দাঁগলারের ইচ্ছা, প্রথমে ভেনিস যাবেন, সেখান থেকে ফিরে যাবেন প্যারিসে। নিশ্চিন্ত মনে নরম আসনে হেলান দিলেন তিনি। গাড়ির দুলুনিতে একটু পরেই চোখ বুজে এলো তাঁর। ঝিমুতে লাগলেন ব্যারন দাঁগলার।

গাড়ি যখন থামলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চোখ মেললেন ব্যারন, তবে তন্দ্রার ঘোর এখনো কাটেনি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলেন কোথায় এসেছেন দেখার জন্যে। ভেবেছিলেন দেখবেন কোনও শহর, নিদেনপক্ষে গ্রামের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় একটা বাড়ির ধ্বংস্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না চারপাশে। ব্যাপার কী ভাবার চেষ্টা করছেন তিনি, এমন সময় ছায়ার মতো তিন চারটে মূর্তি দেখতে পেলেন, এগিয়ে আসছে গাড়ির দিকে। সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন দাঁগলার। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝটাং করে খুলে গেল গাড়ির দরজা।

'বেরোও!' কঠোর কণ্ঠে আদেশ করলো কেউ।

মুহূর্তে তন্দ্রা ছুটে গেল, সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলেন দাঁগলার। পরিস্থিতিটা বুঝতে বিলম্ব হলো না। তাড়াতাড়ি নেমে এলেন তিনি গাড়ি থেকে। চারপাশে তাকালেন। কালো পোশাক পরা চারটে মূর্তি ঘিরে রেখেছে তাঁকে।

'এসো আমার সাথে!' বললো একজন।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আদেশ পালন করলেন ব্যারন। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে লোকটার পেছন পেছন চললেন। ঝোপঝাড়ে ছাওয়া ছোট একটা পাহাড়ের কাছে পৌঁছে মন্থর হয়ে এলো তাঁর গতি। কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোলো না।

'কী হলো! জলদি করো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমক দিলো সেই একই কণ্ঠস্বর, কণ্ঠস্বরের মালিক আর কেউ নয়, পেপিনো।

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললেন দাঁগলার। অবশেষ মাটির নিচে চলে যাওয়া সুড়ঙ্গের মতো এক গুহার মুখে পৌঁছে আতঙ্কিত হয়ে থেমে পড়লেন তিনি। পেপিনো নেমে গেল গুহায়। পেছন থেকে তীব্র এক ধাক্কা খেয়ে দাঁগলারকেও তাই করতে হলো।

কিছুদূর গিয়ে চকমকি ঠুকে একটা মশাল জ্বাললো পেপিনো। তারপর আবার এগিয়ে চললো সুড়ঙ্গ ধরে। পেছন পেছন আসা দুই লোকের ধাক্কা খেয়ে দাঁগলারও এগোলেন। কিছুক্ষণ পর দাঁগলার লক্ষ করলেন দু'ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে সুড়ঙ্গ। বাঁয়ের পথ ধরলো পেপিনো। এসময় একবার দাঁড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন দাঁগলার। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ধাক্কা লাগলো পিঠে। অস্ফুট এক আর্তনাদ করে পেপিনোকে অনুসরণ করলেন তিনি।

কিছুদূর গিয়ে নিচু একটা দরজা খুললো পেপিনো। মশালটা উঁচু করে দাঁগলারের দিকে তাকালো। দরজার দিকে ইশারা করে হাঁক ছাড়লো, 'ঢোকো!'

নিরুপায় দাঁগলার ঢুকে পড়লেন মাটি খুঁড়ে বানানো ছোট্ট কুঠুরিটায়। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর হুড়কো লাগানোর শব্দ।

যারা ওঁকে ধরে এনেছে নিশ্চয়ই তারা ডাকাত, ভাবলেন ব্যারন। কিন্তু, তাহলে আটকে রাখলো কেন? মুক্তিপণ চাইবে? বোধহয়। কত চাইবে? এক লক্ষ ফ্রাঁ? কে জানে কত চাইবে। শঙ্কিত মুখে চারদিকে তাকালেন তিনি। কুঠুরিটা ছোট বটে, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শুকনো। মাঝখানে একটা সস্তাদরের কাঠের টেবিল, একটা টুল আর দেয়ালের কাছে একটা চৌকি। ধবধবে বিছানা পাতা। গত পাঁচ ছ'রাত ভালো করে ঘুমাননি দাঁগলার। পরিষ্কার বিছানাটা দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, ভীষণ ক্লান্ত তিনি। শঙ্কা, ভয়, দুশ্চিন্তা সব দূরে সরিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন ব্যারন। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লেন নিজেও জানেন না।

দশ

ঘুম ভাঙার পর প্রথম কিছুক্ষণ দাঁগলার বুঝতে পারলেন না কোথায় তিনি। মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছেন। তারপরই একে একে মনে পড়ে গেল কালকের সব কথা। ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে কুঠুরিতে। বিছানা থেকে নেমে সেদিকে এগোলেন তিনি। দরজার ওপর দিকে ছোট একটা ফোকর। সেখান দিয়ে উঁকি দিলেন ব্যারন। দৈত্যের মতো বিশালদেহী এক দস্যুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন দরজার সামনে। বিরাট ভাঁটার মতো চোখ, পুরু ঠোঁট আর থ্যাবড়া নাকওয়ালা লোকটা খাচ্ছে। কালো রুটি, পনির আর পেঁয়াজ। তার খাওয়া দেখে দাঁগলার অনুভব করলেন কতখানি ক্ষুধার্ত তিনি। কাল দুপুরের পর পেটে কিছু পড়েনি। দরজায় ধাক্কা দিলেন ব্যারন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ডাকাতটা।

'আমাকে কিছু খেতে দেবে না তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন দাঁগলার।

একবার কেবল কাঁধ ঝাঁকালো দৈত্য। তারপর খাওয়ায় মন দিলো আবার। লোকটা কি তাঁর কথা বুঝতে পারেনি, নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করলো বুঝতে পারলেন না দাঁগলার। লোভাতুর দৃষ্টিতে তার খাওয়া দেখলেন আরো কিছুক্ষণ। শেষে হতাশ মনে বিছানার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লেন আবার।

সময় গড়িয়ে যেতে লাগলো। দৈত্যের জায়গায় নতুন এক দস্যু এলো পাহারা দেয়ার জন্যে। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উঠলেন ব্যারন। পেটটা এমন শূন্য মনে হচ্ছে যে আর কোনও দিন ওটাকে পূর্ণ করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে তাঁর। বিছানা থেকে নামলেন। আবার উঁকি দিলেন দরজার ফোকর দিয়ে। পেপিনোকে দেখলেন, দু'পায়ের মধ্যে একটা পাত্র থেকে রান্না করা ব্যাকন তুলে মুখে দিচ্ছে। পাশে এক ঝুড়ি আঙুর আর এক বোতল মদ। জিভে পানি এসে গেল দাঁগলারের। দরজায় করাঘাত করলেন তিনি। মাংস চিবুতে চিবুতে মুখ তুলে তাকালো পেপিনো।

'আমাকে কিছু খেতে দেবে না তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন ব্যারন।

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো পেপিনোর মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'মহামান্য ব্যারনের খিদে পেয়েছে? কী খাবেন বলুন।'

'আমি—আমার মনে হয় মুরগি হলেই চলবে,' ঢোক গিলে বললেন তিনি।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু আগে দাম দিতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে তাকালেন দাঁগলার পেপিনোর দিকে।

'কত?'

'এক লক্ষ ফ্রাঁ। চিন্তা করবেন না আস্ত একটা মুরগি দেব।'

'এ-ই তাহলে তোমার ফন্দি!' খেঁকিয়ে উঠলেন ব্যারন। 'জাহান্নামে যাও শয়তানের চ্যালা!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার খাওয়ায় মন দিলো পেপিনো।

প্রায় চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আবার দরজার কাছে হাজির হয়েছেন দাঁগলার।

'আমাকে কি না খাইয়ে মারতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কথাটা শুনে ভয়ানক আহত হয়েছে, এমন চেহারা হলো পেপিনোর।

'ছি-ছি-ছি, কী বলছেন, কী বলছেন মহামান্য ব্যারন! আপনাকে না খাইয়ে রাখবো, একটা কথা হলো! কী খাবেন বলুন, এক্ষুণি হাজির করছি আপনার

সামনে। আমাদের সর্দার লুইগি ভ্যামপা সেরকমই নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের।'

'মুরগির যখন এতই দাম, এক টুকরো রুটি দাও আমাকে,' মরিয়া হয়ে বললেন ব্যারন। 'রুটির জন্যে কত দিতে হবে বলো।'

'এক লক্ষ ফ্রাঁ। আমাদের এখানে যা খাবেন সব কিছুর এক দর।'

দাঁতে দাঁত চাপলেন দাঁগলার। 'তার মানে নষ্টামি চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তোমরা! আমাকে না খাইয়েই মারবে?'

'না, সত্যি বলছি, না। আপনি দাম দিলেই আমি খাবার এনে দেবো। আপনার পকেটে কমপক্ষে পাঁচ মিলিয়ন ফ্রাঁ আছে, ইচ্ছে করলেই পঞ্চাশটা রান্না করা মুরগি কিনতে পারেন।'

ভয়ানক ক্রোধে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হলো দাঁগলারের। এমন সময় আবার মোচড় দিয়ে উঠলো পেটটা। সামলে নিয়ে বললেন, 'কীভাবে টাকা দেবো তোমাদের, আমার কাছে তো নগদ নেই।'

'নগদ দরকার নেই, থমসন অ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ-এর নামে একটা নির্দেশপত্র লিখে দিন, তাহলেই হবে।'

কোনও উপায়ান্তর দেখতে পেলেন না ব্যারন দাঁগলার।

'ঠিক আছে, কাগজ কলম আনো,' হতাশ মুখে তিনি বললেন।

কাগজ, কলম, কালি নিয়ে এলো পেপিনো। নির্দেশপত্র লিখে সই করে দিলেন দাঁগলার। বিরস কণ্ঠে বললেন, 'কই, এবার আমার মুরগি আনো।'

'নিশ্চয়ই, মহামান্য ব্যারন।'

মুরগির আয়তন দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না দাঁগলারের। এই রকম পাঁচটা মুরগি তিনি এক বেলায়ই খেতে পারেন। মুখে বললেনও কথাটা, 'এইটুকু মুরগির দাম এক লক্ষ ফ্রাঁ!'

'জি। আমাদের এখানে দাম একটু বেশি, তবে খেতে খুব সুস্বাদু,' জবাব দিলো পেপিনো। 'ভালো জিনিসের দাম তো একটু চড়া-ই হবে, কী বলেন?'

ঘণ্টা দুয়েক পর আবার পেটের ভেতর মোচড় দিতে লাগলো খিদে। ব্যারন দাঁগলার চিৎকার করে উঠলেন, 'খাওয়ার মতো আর কিছু আছে নাকি তোমাদের এখানে?'

'নিশ্চয়ই, মহামান্য ব্যারন, কী খাবেন বলুন? দাম দিলেই এনে দেবো।'

এই ভাবে শুরু। যত দিন যেতে লাগলো ব্যারনের পকেট ততই শূন্য হতে লাগলো। দিনে অন্তত এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) ফ্রাঁ খরচ করতে হলো তাঁকে পেট ভরে খাওয়ার জন্যে। ষষ্ঠ দিন সকালে যথারীতি খাবার নিয়ে এলো পেপিনো। কিন্তু আজ আর কোনও নির্দেশপত্র লিখে দিতে পারলেন না দাঁগলার। থমসন আর ফ্রেঞ্চ-এর কাছে তাঁর যা ছিলো সব দিয়ে দিয়েছেন ডাকাতদের।

'টাকা নেই?' বললো পেপিনো। 'তাহলে খাবারও নেই। বসে বসে হাওয়া খান, জনাব ব্যারন।'

সত্যিই এর পর আর খাবার দিলো না ওঁকে ডাকাতরা। একদিন কাটলো।

কাকুতিমিনতি করলেন ব্যারন: 'দয়া করে কিছু খেতে দাও আমাকে, তোমাদের পায়ে ধরি!' লাভ হলো না কোনও। দু'দিন কাটলো। তৃতীয় দিন কান্নাকাটি শুরু করলেন দাঁগলার। সেই সাথে প্রলাপ বকছেন। চতুর্থ দিনে আর মানুষ রইলেন না তিনি। ঘরের ভেতর যা পেলেন, বিছানা, বালিশ, টেবিল, টুল সবই একবার করে খাওয়ার চেষ্টা করে দেখলেন। অবশেষে টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ালেন দরজার কাছে।

'সর্দার!' জড়িত গলায় বললেন তিনি। 'তোমাদের সর্দারকে ডাকো!'

একটু পরেই কালো পোশাক পরা দীর্ঘ এক মূর্তি এসে দাঁড়ালো কুঠুরির দরজায়।

'আমি লুইগি ভ্যামপা,' গমগম করে উঠলো তার ভারি গলা। 'কী চাও তুমি?'

'আমি বাঁচতে চাই!' চিৎকার করলেন দাঁগলার। 'আর কিছু না, শুধু বাঁচতে চাই!'

দরজা খুলে দিলো ভ্যামপা। 'যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে তাহলে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ফুঁপিয়ে উঠে বললেন ব্যারন।

'দুনিয়ার বহু মানুষ এর চেয়ে অনেক বেশি ভুগেছে।'

'না, তোমরা আমাকে যা কষ্ট দিলে এমন কষ্ট কেউ কোনও দিন পায়নি।'

'পেয়েছে!' অন্য একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো এবার। 'চারদিন না খেয়েই এই অবস্থা, যারা না খেতে পেয়ে মারা যায় তাদের কষ্টটা বোঝো?'

মুখ তুলে ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাকালেন দাঁগলার।

'এখন কী অনুতাপ হচ্ছে তোমার?' প্রশ্ন করলো সেই প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর। এমন কিছু একটা ছিলো সেই স্বরে যে সরসর করে খাড়া হয়ে গেল ব্যারন দাঁগলারের ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো। আধো আলো আধো অন্ধকারে আলখাল্লায় মোড়া একটা অবয়ব দেখতে পাচ্ছেন তিনি। দস্যু-সর্দারের পেছনে।

'কী- কী জন্যে অনুতাপ?' স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ব্যারন।

'জীবনে যে পাপ করেছো সেজন্যে।'

'ও, হ্যাঁ- হ্যাঁ! আমি- আমি অনুতপ্ত!'

'বেশ, তাহলে আমি ক্ষমা করলাম তোমাকে,' আলখাল্লা খুলে ফেলে আলোয় বেরিয়ে এলো অবয়বটা।

রক্তশূন্য হয়ে গেল ব্যারন দাঁগলারের মুখ। আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। 'কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো!'

'ভুল ভেবেছো, দাঁগলার। আমি কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো নই। তুমি যার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলে আমি সেই লোক; যার নিরীহ বাবাকে তুমি অনাহারে মরতে বাধ্য করেছিলে আমি সেই লোক। এখনো চিনতে পারোনি? আমি এডমণ্ড দান্তে!'

ফুঁপিয়ে উঠে একটা চিৎকার করলেন ব্যারন, এবং মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

'ওঠো,' বললেন কাউন্ট, 'ভয় নেই তোমার। বলেইছি তো, তোমাকে ক্ষমা করেছি। লুইগি ভ্যামপা তোমার কাছ থেকে যে পাঁচ মিলিয়ন ফ্রাঁ নিয়েছে সেটা পৌঁছে যাবে হাসপাতালে। এখন উঠে খাওয়া দাওয়া করে নাও। আশা করি এরপর স্বভাব চরিত্র একটু বদলাবে তোমার। ভ্যামপা, খাওয়া হলে একে ছেড়ে দিও।'

কয়েক সেকেণ্ড পর যখন মুখ তুললেন, ভ্যামপার পেছনে অপসৃয়মান একটা ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না দাঁগলার।

ফল এবং মদ আনার নির্দেশ দিলো ভ্যামপা। দাঁগলারের খাওয়া শেষ হলে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বড় রাস্তার কাছে। একটা গাছের গুঁড়িতে ব্যারনকে হেলান দিয়ে বসিয়ে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল ভ্যামপা ও তার সঙ্গীরা।

সারারাত সেখানে বসে রইলেন দাঁগলার। ভোর হলে দেখলেন, কাছেই একটা ঝরনা। তৃষ্ণার্ত তিনি। পানি খাওয়ার জন্যে উঠে গেলেন ঝরনার কাছে। আঁজলা ভরে পানি তুলবার জন্যে যেই মাথা ঝোঁকালেন, পানিতে পড়া প্রতিবিম্বে দেখলেন, তাঁর চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে।

উপসংহার

আকাশে পূর্ণ চাঁদ। চারদিকে ঢেউ-এর রাজ্য, মাঝখানে মাথা তুলেছে ছোট্ট দ্বীপ মন্টিক্রিস্টো। দ্বীপের পাহাড়ী সৈকতে থৈ থৈ করে এসে হারিয়ে যাচ্ছে ঢেউ। চাঁদের আলোয় রূপালী রং ধরেছে সাগর, দ্বীপ, আকাশের মেঘ।

দ্বীপের ছোট্ট একটা খাঁড়ির আশ্রয়ে নোঙর করে আছে একটা ইয়ট। সামনের গলুইয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহী ছিপছিপে এক মানুষ। দ্বীপের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে কথা বলছে সে। চাঁদের আলোয় ফ্যাকাসে মুখটা আরো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। তার পায়ের কাছে একটা কম্বল বিছিয়ে বসে আছে পুব দেশীয় পোশাক পরা অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী।

হঠাৎ মাথা নাড়লো লোকটা। দ্বীপের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকালো নিচে মেয়েটার পানে। চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি। একটু হাসলো সে। বললো, 'এই হলো এডমণ্ড দান্তের কাহিনী। আবার বেঁচে উঠেছে সে—কাউণ্ট অভ মন্টিক্রিস্টো মারা গেছে। এবার তুমি, হেইডি, যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারো। অনেকগুলো বছর আপনজনের মতো আমার সাথে থেকেছো, কিন্তু এবার বোধহয় নিজের দেশের জন্যে মন টানছে তোমার। সংকোচ কোরো না, তুমি চলে যাও; তোমার বাবার সম্পত্তি, মর্যাদা সব যেন তুমি ফিরে পাও তা আমি দেখবো।'

বড় বড় দুটো চোখ মেলে তার দিকে তাকালো হেইডি।

'আমাকে ছেড়ে চলে যাবে তুমি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সে।

'তোমাকে ইয়ানিনায় পৌঁছে দেবো। তোমার বয়স অল্প, তুমি সুন্দরী। আমার কথা ভুলে যাও, সুখী হবে!'

হেইডির চোখের দিকে তাকালো দান্তে। যা দেখলো তাতে চমকে উঠতে হলো ওকে।

'তুমি কাঁদছো! কেন? আমাকে ছেড়ে যেতে চাও না?'

'আমার বয়স কম,' জবাব দিলো হেইডি। 'জীবনকে আমি বড় বেশি ভালোবেসে ফেলেছি। জীবন ধারণের মাঝে যে এত আনন্দ, এত সুখ তা আগে কখনো বুঝিনি। এ জীবন ছেড়ে মরতে খুব কষ্ট হবে আমার।'

'মানে আমি! তোমাকে ছেড়ে গেলে…'

'আমি মরবো!'

'কেন?'

'কেন! আর কে আছে আমার? তুমিই আমার একমাত্র আত্মীয় এ পৃথিবীতে। তুমিই যদি আমাকে ছেড়ে যাও তাহলে আর আমি বেঁচে থাকবো কেন?'

হেইডির জন্যে অপূর্ব এক স্নেহ অনুভব করলো দান্তে তার হৃদয়ের গভীরে।

আর কিছু না ভেবে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিলো সে। হেইডি অস্ফুট এক চিৎকার করে ছুটে গেল সেই দু'হাতের ভেতর।

'ঠিক আছে, হেইডি,' দান্তে বললো, 'তোমাকে আঁকড়ে ধরেই আমি আমার অতীতকে ভুলে থাকবো।'

কান্না ভেজা হাসি নিয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো হেইডি। আর ওদের পেছনে মণ্টিক্রিস্টো দ্বীপ, চাঁদের আলোয় নাইতে নাইতে ঘুমিয়ে রইলো শান্ত সাগরের বুকে।

***

কিশোর ক্লাসিক

কাউণ্ট অভ মণ্টিক্রিস্টো

আলেকজান্দার দ্যুমা/নিয়াজ মোরশেদ

বিয়ের আসর থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো নিরপরাধ নাবিক এডমণ্ড দান্তেকে। পাঠিয়ে দেয়া হলো ফ্রান্সের ভয়ঙ্করতম কারাগার শ্যাতো দ'ইফ-এ। একবার ঢুকলে কেউ জীবিত ফেরে না সেখান থেকে। সাত-সাতটি বছর কাটিয়ে দিল দান্তে কারাগারের দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটে। তারপর একদিন...ঠুক্ ঠুক্! মৃদু শব্দ ভেসে এল মাটির নীচ থেকে! সুড়ঙ্গ খুঁড়ে উঠে আসছে কেউ। কে? বন্ধু। এই প্রথম একজন সত্যিকার বন্ধু পেল দান্তে। দুজনে মিলে ঠিক করল পালাবে। তারপর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০